লাভের বেলায় ঘণ্টা

শিবরাম চক্রবর্তী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৬০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

আমার সদ্য প্রকাশিত নাতি

কল্যাণীয়

শ্রীমান জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়যুক্তেষু

—শিব্রাম দাদু

সূচী

লাভের বেলায় ঘন্টা! ... ১
নেমন্তন্ন? আমার জন্য! ... ১০
দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ! ... ২৪
টুকটুকির গল্প ... ৪০
চকরবরতিরা সহজ নয়! ... ৫০
চশমার ডাঁট ... ৬০
ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ ... ৬৯
তিন ওয়ালা আর এক ওয়ালী... ৭৮
ইচ্ছাপূরণ ... ৮৯
গাছের বিড়ম্বনা ... ১০১

লাভের বেলায় ঘণ্টা !

ঘাটশিলার শান্তিঠাকুর বলেছিলেন আমায় গল্পটা···ভারী মজার গল্প।

দারুণ এক দুরন্ত ছেলের কাহিনী···

যত রাজ্যের দুষ্টবুদ্ধি খেলত ওর মাথায়। মুক্তিপদ ছিল তার নাম, আর দুষ্টুমিরাও যেন পদে পদে মুক্তি পেত ওর থেকে। আর হাতে হাতে ঘটত যত অঘটন !

এই রকম অযথা হস্তক্ষেপ আর পদক্ষেপের ফলে একদিন যা একটা কাণ্ড ঘটল···

গাঁয়ের শিবমন্দিরের ঘণ্টাটার ওপর ওর লোভ ছিল অনেক দিনের।

শিবঠাকুরের মাথার ওপর ঘণ্টাটা থাকত ঝোলানো। শিব-রাত্রির দিন ওটাতে দড়ি বেঁধে দেওয়া হতো। ভক্তরা সেই দড়ি ধরে টান মেরে একবার করে বাজিয়ে যেতো ঘণ্টাটা।

কী মিষ্টি যে ছিল তার আওয়াজ !

শিবরাত্রির পর্ব ছাড়া আর কোনদিন ওটা বাজানো হতো না কিন্তু।

শিবঠাকুরের পাশেই ছিলেন পার্বতী দেবী। তাঁর মাথায় ঝকমক করত সোনার মুকুট। কিন্তু সেদিকে মুক্তিপদর মোটেই নজর ছিল না।

মুক্তিপদ তক্কে তক্কে থাকত কি করে ঘণ্টাটা হাতানো যায়।

একদিন সে দেখল পূজারী ঠাকুর কোথায় যেন বেরিয়েছে, মন্দির ফাঁকা পড়ে। চারধারে কেউ কোথ্থাও নেই।

সুবর্ণসুযোগ জ্ঞান করে সে মন্দিরের ভেতরে গিয়ে সেঁধুলো।

কিন্তু হাত বাড়িয়ে ছাখে যে ঘণ্টাটা তার নাগালের বাইরে। যদ্দূর তার হাত যায়, তার থেকেও এক হাত ছাড়িয়ে ওপরে রয়েছে ঘণ্টাটা।

ওটাকে পাড়ার জন্য সে তাই শিবলিঙ্গের মাথার ওপরে খাড়া হ'ল।

কিন্তু তখনো সেটাকে হাত দিয়ে পাকড়ানো যায় না, আঙুলে ঠেকে. কিন্তু মুঠোর মধ্যে আনা যায় না ঘণ্টাটাকে!

ভারী মুস্কিল তো! কিন্তু এ কী···! শিবের মাথায় চড়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল সেই অঘটনাটা!

স্বয়ং শিবঠাকুর তার সম্মুখে আবির্ভূত! মুক্তিপদর পদক্ষেপেই দেবাদিদেব মুক্তি পেলেন নাকি?

'বৎস, তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা করো।'

'অ্যাঁ?' হকচকিয়ে গেছে মুক্তিপদ।

'ভয় খেয়ো না। তুমি কি আমায় চিনতে পারছো না?'

'চিনব না কেন? তুমি শিবঠাকুর। দেখেই টের পেয়েছি। পটে দেখেছি তো। পটের সঙ্গে বেশ মিলে যায়।'

'তোর মতন ভক্ত আর হয় না।' শিবঠাকুর বলেন, 'লোকে আমার মাথায় ফুল বেলপাতা চড়ায়, তুই নিজেকেই আমার ওপর চড়িয়েছিস। তোর সবটাই দিয়েছিস আমায়। তোর মতন ভক্ত

আমি দেখিনি। এখন বল্ তুই কী চাস ?'

'কী আবার চাইব !' থতমত খেয়ে সে বলে।

'রাজা হতে চাস তুই ?'

'রাজা !'

'অনেক লোক-লস্কর নিয়ে বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হবার বাসনা আছে তোর ?'

মুক্তিপদ ভাবতে থাকে।

'সে ভারী ঝামেলা !' ভেবে-চিন্তে সে জানায়ঃ 'রাজা হতে আমার প্রাণ চায় না। রাজ্যি চালানো আমার কম্মো নয়। কি করে রাজ্য চালায় তাই আমি জানিনে !'

'তাহলে কী চাস বল ? পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যে ?'

'রাজকন্যে নিয়ে আমি কী করব ?'

'কেন, বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না করবি ? আবার কী ?'

'বিয়ে ! এখনই আমি বিয়ে করব কি ! আমার গোঁফ বেরয়নি এখনো। তুমি বলছো কি ঠাকুর ?'

'তাহলে হাতী ঘোড়া কী চাস বল্ তুই !' বর দিতে এসে এমন বিড়ম্বনা শিবঠাকুরের বুঝি কখনো হয়নি।—'আমি তোকে বর দিতে চাই। বর না দিয়ে আমি ছাড়ব না।'

'হাতী ঘোড়া কি কেউ চায় নাকি আবার ?'

'টাকাকড়ি ধনদৌলত ?'

'রাখব কোথায় ? বাবা টের পেলে মারবে না ? একবার বাবার একটা টাকা সরিয়েছিলাম, তাইতেই এমন একখানা চড় খেয়েছিলাম যে !···এখনো আমার মনে আছে বেশ। না, টাকাকড়ি আমার চাইনে।'

'তোর দেখছি কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি নেই। মুক্তপুরুষ মনে হচ্ছে। তাহলে তুই কি চাস—ভক্তি, মুক্তি?'

'সে তো আমার পাওয়া গো। আমার নামই মুক্তি। আর আমার বাবার নাম ভক্তিপদ—ভক্তি মুক্তি তো না-চাইতেই পেয়ে গেছি।'

'তাহলে তুই হয়ত চাস, মনে হচ্ছে, ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা—'

'সে তো বিবেকানন্দরা চায়। পড়েছি বইয়ে। আমি বিবেকানন্দ হতে চাই না।'

'ভাল ফ্যাসাদ হ'ল দেখছি।' মহাদেব নিজের জটাজুট চুলকোন। ছেলেরা কী চাইতে পারে, কী তাদের চাওয়ানো যায়, কিছুই তিনি ভেবে পান না।

নিজের ছেলেবেলায় কী সাধ ছিল তাঁর? তাও কিছু তাঁর স্মরণ নেই এখন। সেই সুদূর অতীত বাল্যকালের কথা তার মনেই পড়ে না আর। কবে যে তিনি দুগ্ধপোষ্য বালক ছিলেন, আদৌ ছিলেন কিনা কখনো—কিছুই তাঁর ঠাওর হয় না।

কী চাইতে পারে ছেলেটা? কী পছন্দ হতে পারে ছেলেটার? তিনি খতিয়ে দেখতে যান। তাঁর আর তার টান সমান হবার কথা নয়। আদ্যিকালের তিনি আর সেদিনকার এই ছোঁড়ার রুচি কি এক হবে? যে বস্তু তাঁর প্রিয় ওর কাছে হয়ত তা মূল্যহীন। ছেলেটা এই বয়সেই চোখে ধুতরো ফুল দেখতে রাজী হবে কি? বিল্বফলের জন্যেও সাধ করে হাত বাড়াবে না নিশ্চয়?

মাথায় হাত দিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন। কূল-কিনারা পান না কিছু।

হঠাৎ নিজের কপালের চাঁদে তাঁর হাত ঠেকে যায়। হাতে

যেন চাঁদ পান তখন।

'এই চাঁদ?' তিনি উচ্ছ্বসিত হন—'এই চাঁদখানা তুমি পেতে চাও নিশ্চয়? এমন চাঁদ পাবার সাধ হয় না তোমার?'

প্রস্তাবটা শুনে মুক্তিপদ নাক সিঁটকোয়। চাঁদ নিয়ে সে কী করবে? মা যেমন খোঁপায় চুলদের আটকে রাখার জন্য চিরুনি লাগান, শিবঠাকুর তেমনি নিজের জটাজূট সামলাতে ঐ চাঁদটাকে লাগিয়েছেন।

মুক্তিপদর তো ঝাঁকড়া চুলের বালাই নেই, দিব্য ব্যাক-ব্রাশ চুল তার। চাঁদকে মাথায় করে রাখবার সখ নেইকো মোটেই। চাঁদ না হয়ে চন্দ্রপুলি হলে না হয় দেখা যেত।

'ও তো আধখানা চাঁদ, ও নিয়ে আমি কী করব? আপনি বুঝি আমায় অর্ধচন্দ্র দিচ্ছেন? ঘুরিয়ে অপমান করছেন আমায়?' ফোঁস করে ওঠে সে—'আপনি সোজাসুজিই বলতে পারতেন, আমার মন্দির থেকে বেরিয়ে যাও।'

'না না। তা বলব কেন? তা কি বলতে আছে?' শিবঠাকুর শশব্যস্ত হন—'এত বড়ো ভক্ত তুমি আমার। তোমাকে আমি অমন কথা বলতে পারি কখনো? ভক্তাধীন ভোলানাথ, শোনোনি নাকি কথাটা?'

'তাই বলুন!'

'আমি ভাবছিলাম চাঁদের টুকরোটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে তুমি দেখতে যদি একবারটি। আর যদি তোমার পছন্দ হ'ত…'

'চাঁদে হাত দিতে যাব কেন আমি? আমি কি বামন নাকি যে…? বামনরাই তো চাঁদের দিকে হাত বাড়ায়। আমি বেশ ঢ্যাঙা, দেখছ না? এর মধ্যেই পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। বাবা

বলছেন, আরো আমি ঢ্যাঙা হব। আমাদের বংশে সবাই নাকি তালগাছ!'

'তাহলে তো তুমি এমনিতেই চাঁদ পাবে। তালগাছের মাথাতেও চাঁদ থাকে। দেখা যায় প্রায়। ছাখোনি তুমি?'

'পুকুরের জলের মধ্যেও দেখেছি। ডোবার মধ্যেও আবার।'

'চাঁদের সঙ্গে আমাকেও তুমি ডোবালে দেখছি! ভারী ফ্যাসাদে ফেললে আমায়। বর দেব বলে কথা দিয়েছি, অথচ কিছুই তোমায় দিতে পারছি না। কিছুই তুমি চাও না। অথচ দিতেই হবে আমায় কিছু। না দিয়ে উপায় নেই। নইলে আমার কথাটা মিথ্যে হয়ে যায়। মিথ্যে কথা আমি বলি না আবার। কী মুস্কিলে যে পড়লাম। আচ্ছা, তুমি কি কিছু খেতে চাও?'

খাবারের কথায় তার উৎসাহ দেখা দেয়—'কী খাওয়াবেন বলুন?'

'কী খাওয়ানো যায় তোমায় ভাবছি তাই।' শিবঠাকুর বলেন—'সত্যি বলতে, আমাকেই সবাই ভোগ দেয়, আমি কখনো কাউকে ভোগ দিইনি কোনো। এমন কি তোমার ওই পার্বতী ঠাকরুণকেও না। তোমার ভোগে কী লাগতে পারে ভেবে দেখি এখন···।' তিনি ভাবতে থাকেন।

'তারকেশ্বরের ডাব?' হাতের কাছে প্রথমেই তিনি ডাবটা পান, সেটাই পাড়েন সবার আগে।

'ডাব? ডাব কেন? আপনার সঙ্গে আমার তো আড়ি হয়নি যে ডাব দিয়ে ভাব পাতাতে হবে?'

'তাহলে বৈদ্যনাথধামের প্যাঁড়া?···কাশীর মালাই-লচ্ছি? কৈলাসের ভাং?'

'ভাংটা কী জিনিস ?' জানতে চায় মুক্তিপদ।

কিন্তু মহাদেব ওর বেশি ভাঙতে যান না। ছোট্ট ছেলের কাছে নেশার কথা পাড়াটা ঠিক হবে না তাঁর মনে হয়।—নন্দী ভৃঙ্গী ঘোঁটে, তারাই বানায়, তারাই জানে কী জিনিস।

তারপর ঘুরিয়ে বলেন কথাটা—'ভাং মানে, এই সিদ্ধি আর কি—শুদ্ধ ভাষায়। তুমি কি সিদ্ধিলাভ করতে চাও ?'

'একদম্ না। ও তো সাধক লোকেরা চায়। আমি কি সাধক ? যোগী ঋষি আমি ? তাহলেও শুনি তো—'

'আমি খাই কেবল। মানে, আমি পান করি মাত্র।'

'খেতে কেমন ? সিরাপের মতন কি ? আখের রস যেমন ধারা হয়ে থাকে ? খেতে মিষ্টি হলে দিতে পারেন আমায়।'

'না, তা খেয়ে তোমার কাজ নেই। পানীয় তো আর খাদ্য নয়। ওতে পেট ভরে না। তোমাকে আর কী দেওয়া যায় দেখছি···' মনে মনে তিনি দিগ্বিদিক ঘোরেন, যে খাবারগুলি তাঁর দিব্যনেত্রে দেখতে পান, আউড়ে যান···

'মালদহের খাজা খাবে ? কেষ্টনগরের সরভাজা ? বর্ধমানের মিহিদানা ? রানাঘাটের ছানার জিলিপি ? জনাইয়ের মনোহরা ? পাঁশকুড়োর অমৃতি ? নাটোরের দেদোমণ্ডা···?'

'গণ্ডা গণ্ডা ?' মুক্তিপদ বাধা দিয়ে জানতে চায়।

'যতো চাও! বাগবাজারের রসগোল্লা ? ভীমনাগের সন্দেশ ?···' শিবঠাকুরের ফিরিস্তি আর ফুরোয় না : 'চাই তোমার ? কোন্‌টা চাই বলো আমায় ? না, সবগুলোই চাও তুমি ?'

'আমার জন্যে হয়রান হয়ে ঘুরে ঘুরে আপনি যোগাড় করবেন তা আমি চাই না, আপনার হাতের কাছে যা আছে তাই

আমায় দিন।'

'হাতের কাছে? পার্বতী দেবীর ঐ স্বর্ণমুকুটটা চাও_ বুঝি?' তিনি দেবীর দিকে হাত বাড়ান।

'না না। সোনার মুকুট নিয়ে আমি কী করবো? ওটা তো পরাও যাবে না। পরতে গেলে লাগবে আমার মাথায়। তাছাড়া মুকুট পরে বেরুলে পাড়ার ছেলেরাই বা বলবে কী?'

'তাহলে কী তোমার চাই বলো তাই।'

'আপনার মাথার ওপরে ঐ যে ঘন্টা! ওটাই আমি চাই— ঐটে আমায় পেড়ে দিন!'

'বাঁচালে!' বলে হাঁফ ছেড়ে মহাদেব ওর হাতে ঘন্টাটা তুলে দেন। দিয়েই অন্তর্ধান হন।

মুক্তিও ঘন্টা নিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে আসে।

ঘন্টাটা তাকে কষ্ট করে বাজাতেও হয় না। ওর লাফ-ঝাঁপের দাপটে সেটা আপনিই বাজতে থাকে।

নেমন্তন্ন ? আমার জন্য !

মা বলতেন, 'না খেয়ে কদাচ নেমন্তন্ন যাবিনে। কোথ্‌থাও না, কক্ষনো নয়।'

আমি বলতাম, 'সে কী মা! খাওয়ার জন্যই তো নেমন্তন্ন যাওয়া। খেয়েদেয়ে যাওয়ার কি কোনো মানে হয়? খেয়ে নেমন্তন্ন যাওয়াটা কী আবার?'

আমার তো ধারণা, নেমন্তন্ন যেতে হলে আগের দিন থেকে বিলকুল না খেয়ে থাকতে হয়—এমনকি কুলটি পর্যন্ত না। তবেই না, পরের দিন চন্‌চনে খিদে নিয়ে নেমন্তন্নের পাতায় চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় উপাদেয় ইত্যাদির ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়া যায়—আগাপাশতলা ঠেসে গিলে আসা যায়। তারপর যা থাক্ কপালে!

'কেন মা, এমন কথা বলছ কেন?' শুধিয়েছিলাম মাকে।

'গেলেই দেখবি···দেখতে পাবি যে···বুঝতে পারবি তখন যে হ্যাঁ, বলেছিল মা।'

'কী বুঝব মা? নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়ে দেখব, পাতা পড়া দূরে থাক, পাত্তাই নেই কারো? সব ঢুঁ ঢুঁ? সবাই হাওয়া?'

'তা কী বলছি নাকি!'

'তবে কী? আমার আগেই খাইয়েরা গিয়ে চেটেপুটে সাফ করে গেছে সব? তাই বলছ তো? সবই মানে, খাদ্যাখাদ্য সব হাওয়া! তখন হাওয়া খাওয়াই সার। গিয়ে হাওয়া খেয়ে ঘুরে আসো—এই

বলছ তো ?'

'উঁহু।'

'কিন্তু আমি তা হতে দেব কেন মা ? আমি সবার গোড়ায় গিয়ে পাতার মাথায় বসে থাকব'খন। নেমন্তন্ন যে খাওয়ায় তার যতই সর্বনাশ হোক না, যারা খেতে যায় তাদের তো পৌষমাস। পোষপিঠে খেতে গিয়ে উপোস পেটে ফিরে আসে কেউ ? তা কি হয় নাকি মা ?'

'হয় নাকি তা টের পাবি তখন, এখন কী !'

এতদিন বুঝতে পারিনি, কিন্তু মার কথাটি যে কতো খাঁটি টের পেয়েছি সেদিন !

সত্যি, মার দরদ যেমন মাসিতেই বেশি ফলাও, তেমনি তাঁর কথাটা বাসি হলেই ফলে বেশি ! মিথ্যে না !

মার কথাটা ঘড়ির মতন কাঁটায় কাঁটায় সত্যি হয়ে ক'দিন আগেই ফলেছে—সেই কথাই বলছি !

'নতুন রেস্তরাঁ খুলেছি ভাই !' নিবারণ এসে ধরল আমায়—'নেমন্তন্ন করতে এলাম ভাই।'

নেমন্তন্নের কথায় লাফিয়ে উঠলেও মার কথাটা মনে পড়ায় বসে পড়ি। ক্ষীণস্বরে কই—'বলো কী হে ?'

'হ্যাঁ। সব পাবে আমার রেস্তরাঁয়।' হাতের খাদ্যতালিকা থেকে সে উদাহরণমালা উদ্ধার করতে থাকে—'চপ, কাটলেট, কারি, কোর্মা, মামলেট, ফিশ ফ্রাই, মাটন এবং পাঁঠন্—তাছাড়া ওই তোমার দোপেঁয়াজিও—'

আরো পেঁয়াজি ছাড়ার আগে বাধা দিয়ে জানতে যাই—'পাঁঠন্‌টা কী ?'

'পাঁঠা। সাদা বাংলায়। ইংরেজি করে পাঁঠন্ বলছি, সহজে যাতে বুঝতে পারো। তার পর তোমার ওই কাটলেট আবার দুরকমের—চিংড়ির এবং চ্যাংড়ার।'

'চ্যাংড়ার? তার মানে?' আমি ভড়কাই। পাড়ার ছেলেদের আড়ালে আবডালে ধরে ধরে কাটছে নাকি ও? অনেক রেস্তরাঁয় লুকিয়ে চুরিয়ে কুকুর বেড়াল পাচার করে বলে শুনেছি। কিন্তু ছেলেপিলেরা সিনেমায় সিনেমায় ঘুরে বেড়ালেও আর তার হিন্দী গানা ম্যাঁও ম্যাঁও সুরে ছাড়লেও বেড়ালের মধ্যে তাদের গণ্য করা যায় না ঠিক। এবং আমার ধারণায়, এক পরীক্ষার খাতায় ছাড়া ছেলেরা আর সর্বত্রই অকাট্য।

'আহা, ঐ চিংড়ির কাটলেটই। তাই আমাদের চ্যাংড়াদের জন্যে স্পেশিয়ালি বানানো। চ্যাংড়া যারা, তারা চিংড়ির পেছনে ছুটবে এ তো স্বাভাবিক। ফের তারা সস্তাও চাইবে আবার। তাই তাদের জন্যে কুচো চিংড়ির কাটলেট। আর তোমাদের জন্যে বাগদার—গল্‌দার, বুঝেচো? তবে তোমাদের আবার অন্যরকমও আছে—ব্রেস কাটলেট।'

আমি বলি: 'ব্রেশ।'

বেড়ে আর বেশ একসঙ্গে পাকিয়ে বেড়েশ বলতে গিয়ে সন্ধিসূত্রে ব্রেশ হয়ে ওর কাটলেটের মতই গলার থেকে বার করা আমার।

'পেঁয়াজি থেকে দোপেঁয়াজি—সব পাবে। পটাটো চপ থেকে পটাটো চিপ্‌স—যা চাও। চাই কি, তোমার রামপাখিও।'

রামপাখির নামে আমার যেন রামপাখা গজায়। তক্ষুনি উড়ে যেতে চায় ওর পাখিস্থানে।

'যেয়ো না, দেখবে তখন। রামপাখিরা কেমন উড়ছে আমার

রেস্তরায়।' হাসতে হাসতে সে জানায়—'আসতে না আসতে উড়ে যাচ্ছে। পাকঘরের পরে টেবিলের প্লেটে—প্লেটের থেকে পেটে পেটে—দেখতে না দেখতে উধাও।'

'কবে যেতে হবে?' আমি শুধাই—'খুলছে কবে তোমার?'

'খোলাই আছে রেস্তরাঁ। তবে পয়লা বোশেখ এসো। শুভ উদ্বোধন কি না সেদিন। অনেক রকম খাবারদাবার হবে। বিস্তর খদ্দের আসবে আমার রেস্তরাঁয়।'

'কিন্তু আমার তেমন রেস্ত কোথায় ভাই?' পকেটের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি একটু গাঁইগুঁই করি।—'তোমার অত খাদ্যাখাদ্যর দাম দেবার আমার সাধ্য কী।'

'দাম তোমায় দিতে হবে না। অন্ততঃ সেদিনটা নয়। তোমাকে নেমন্তন্ন করছি না আমি? প্রধান আতিথ্য তোমার জন্য। সেদিন তুমিই আমার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। যেতেই হবে তোমাকে।'

তারপর আর নিবারণ করা গেল না। নিবারণ তো দুর্নিবার—কোনো বারণই সে কোনোদিন মানে না—। মার কথাটা মনে রেখেও নিজেকে মানা করা শক্ত হলো আমার।

নেমন্তন্ন! আমার জন্য!!

ভাবতেই আমার আপাদমস্তক লালায়িত। আগাপাশতলা উৎসুক!

আমিই সেদিনকার প্রধান অতিথি। অথচ আমার কোনো দায় নেই আদৌ—না বক্তৃতা দেবার, না দাম। ভয় খাবার কিছু ছিল না, তারি বিস্তার একটুখানিও ভয়ালো নয়।

এ-প্রধান অতিথি সে-প্রধান অতিথি নয়। সভাসমিতির প্রধান

অতিথি হতে গেলে যে সব ধাক্কা পোয়াতে হয় এখানে তার কিচ্ছুটি নেই। গলাবাজির ব্যাপার নয় কোনো, গলা দিয়ে গলিয়ে তলার দিকে চালিয়ে দেওয়া কেবল। মুখের কাজ বটে, কিন্তু মুখর হয়ে নয়, উন্মুখ হয়ে অধোমুখে সারবার। মুখের সঙ্গে হাতাহাতি···হাতের সঙ্গে মুখোমুখি···গলার সঙ্গে ঢলাঢলি—ঢালাও কারবার! এক নাগাড়ে।

সেবার পয়লা বোশেখ পড়েছিল শুক্কুরবার। গুড ফ্রাইডের ঠিক সাত দিন বাদ। নিবারণের সৌজন্যে এটাকে বেটার ফ্রাইডে বলা যেতে পারে। কিম্বা, ফিশফ্রাইডে—যাই বলা যাক।

আগের দিন থেকেই তোড়জোড় লাগালাম। বেস্পতিবারের বার বেলা পড়তেই আমার খাবার বেলা বরবাদ। যখন তখন গিয়ে টুকটাক মারবার জন্য বাসার রান্নাঘরে যাত্রা নাস্তি।

বিকেলের জলখাবার বাদ গেল, রাত্রেও রুটি বন্ধ। শোবার আগে নিয়মিত যে একগ্লাস হরলিক্স খাবার কথা আমার—তাও বাতিল। তিল তিল খেয়ে যদি পেট ভর্তি করি তো কাল বিকেলে নিবারণের তাল সামলাবো কি করে?

সকালে বাসার বালক ডিমের হাফবয়েল নিয়ে এল, তাও হটিয়ে দিলাম অম্লানবদনে। নিবারণের নেমন্তন্ন না আজ? হাফবয়েল খেয়ে খিদে নষ্ট করবে এমন 'বয়েল্' আমি নই এই জোড়ায় জোড়ায় আস্ত রয়েলদের রামরাজ্যে!

দুপুরেও হরিমটর! আর বিকেলে? তখন তো আমার পেটে চোঁ চোঁ খিদে! আমি চিঁ চিঁ করছি। একটা কুচো চিংড়ির কাটলেট পেলেও চিবিয়ে বাঁচি—যদিও শুনেছি তা নাকি আমাদের জন্যে নয়, চ্যাংড়াদের জন্যেই নেহাৎ।

সন্ধ্যে নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম রেস্তরাঁয়। শুভ উদ্বোধনের সন্ধিক্ষণে।

দোর গোড়াতেই পাওয়া গেল নিবারণকে। অভ্যর্থনাসমিতি হয়ে একাই সে দাঁড়িয়ে।

'কী হে তোমার উদ্বোধনের কদ্দূর?'

'তুমি এলেই হয়।' সে জানালো: 'ভেবেছিলাম কাট্‌জু সাহেবকে দিয়ে উদ্বোধন করাবো। তিনি নাকি সব কিছুর উদ্বোধন করেন—জুতোর দোকান থেকে চণ্ডীমণ্ডপের।'

'ভালো হতো তাহলে।' শুনেই আমি উৎফুল্ল, 'লাট সাহেবরাই তো উদ্বোধন সম্রাট আজকাল। সব কাজের কাজী। সব কাজের কাট্‌জুও কইতে পারো।'

'কিন্তু পাড়ার সবাই বাধা দিলো। বারণ করল আমায়।' জানালো নিবারণ: 'বললো যে, পেয়েছো কি তুমি? লাটসাহেব কি তোমার কাটলেট নাকি? যতই কাটজু হোন না, যে, হুট বললেই তিনি ছুটে আসবেন? আমার কাটলেটের নাম খারাপ করে ওই কথা বলল ওরা। তাই আর আনলুম না…'

'বেশ করেছো, বেশ করেছো…' বলতে বলতে রেস্তরাঁয় ঢুকি।

'অগত্যা ঠিক করলাম,' এক প্লেটে গোটাকয়েক কাজুবাদাম এগিয়ে দিলে ও: 'এখন এই কাজুবাদাম দিয়ে তোমার শুভ উদ্বোধন হোক।'

বাদামগুলো পেটের আগুনে গিয়ে পড়লো পেট্রলের ছিটের মতই। আদত খাদ্যের আহুতির আশায় ওর দিকে তাকাতে গিয়ে সামনের দেয়ালে আমার চোখ হোঁচট খেল। সেখানে একটা কার্ড-

বোর্ড লটকানো, তার গায় লেখা :

'আজ নগদ কাল ধার'

এ আবার কী বাবা? নেমন্তন্ন করে ডেকে এ আবার কেমন ধারা? মুখে না বলে ঘুরিয়ে বলা সম্মুখে? এবং ঐ ভাবে? ডেকে এনে ডকে তোলা—কীরকমের ভদ্রতা এ?

ভাবলাম, রেস্তরাঁর অন্য ধারে বসি গিয়ে—যাতে ওটা আমার চোখে না পড়ে, চোখকে না পীড়িত করে। কিন্তু তাতেই বা কী? স্মৃতিশক্তি বলে একটা জিনিস আছে তো? এমনকি—খুব কম করলেও—আমারও আছে। যে ধারেই বসো, তোমাকে নগদ বসতে হবে—ধারে খেয়ে যাওয়া যাবে না—কথাটা মনের মধ্যে গঁদের মতো এঁটে বসে থাকে, সেখান থেকে মোছা যায় না কিছুতেই।

ভাবতেই খিদে আমার মাথায় উঠে যায়!

দেয়ালের মাথায় তাকিয়ে আছি, খেয়ালের মাথায় ওরও চোখ পড়েছে কখন।

'হ্যাঁ ভাই, ওটা লাগাতে হলো—বাধ্য হয়েই। আগে আমি দমদমের দিকটায় চায়ের দোকান খুলেছিলাম, জানো তো?'

'জানি বইকি।' সায় দিই আমি। সেখানকার সেই দমাদ্দম মার খাবার কথাটা আমার মনে পড়ে যায়—মারটা যদিও ওরই পিঠে পড়েছিল কিন্তু অমন পৃষ্ঠপোষকতার চর্চা এখনো আমি ভুলতে পারি না। ভুল করে নিজের পিঠে হাত বুলিয়ে নিই একবার।—'হ্যাঁ, আমার মনে আছে বেশ।'

'তা ভাই, সেখানকার লোকে ধারে খেয়ে খেয়ে বসিয়ে দিলো আমায়। বন্ধুদের ধার দিলে আর তারা ধার মাড়ায় না, জানো তো? সে ধার দিয়েই যায় না আর। শুধবে কি ছাই, ধারই ঘেঁষে না একদম।

আজ নগদ
কালো ধার

তাই সেই দমদমের মতো এখানেও আবার ধারে খাওয়ালে কি কোনোদিন আর উদ্ধার পাবো? তোমাদের বন্ধুত্ব আমি অমূল্য জ্ঞান করি—তার ওপর যদি তোমরা ফের ধারে খাও তার মূল্য তো আরো বেড়েই যাবে দিনকে দিন। তখন সেই বন্ধুত্বের ঋণ কোনোদিন কি শোধ করা সম্ভব হবে কারো? না ভাই, তোমাদের বহুমূল্য বন্ধুত্ব আমি খোয়াতে পারব না। আমাকে তোমরা মাফ করো।'

নিবারণের অমন বক্তৃতার পর পকেট হাতড়াতে হলো আমায় —নিবারণের নয়, নিজের। টাকাটা সিকেটা দু নয়া পাঁচ নয়া মিলিয়ে গোটা পাঁচেক আছে সেখানে আঁচ পেলাম।

কিন্তু তাতেই কি আঁচাতে পারব? বেরুতে পারব আঁচিয়ে? ও তো আমার অমূল্য বন্ধুত্ব খোয়াতে পারবে না বলেই খালাস, এদিকে খেতে এসে আমার কী খোয়ারটা। ছাখো দিকি!

তার পরে দেয়ালের দিকে তাকালেই নজরানার ঘোষণাটা বার বার নজরে পড়তে থাকে।

'ঠিক কথা। বন্ধুকে বন্ধু না রাখলে কে রাখবে? আনো তোমার খাবার—নগদ নগদ। কুছ পরোয়া নেই। দেখি তোমার খাদ্যতালিকা আজকের?'

পকেট থেকে সে বার করলো তার খাদ্যতালিকা।

নিয়ে দেখলাম, যা বলেছিল তাই। পটাটো চপ থেকে পটাটো চিপ্‌স—কী নেই? চপেটাঘাত থেকেই শুরু করব নাকি? ভাবতে ভাবতে ফাউল রোস্‌টের তলাতেই দাগ কেটে বসলাম···

নিলাম হাতে খাদ্যতালিকা। খাদ্যাখাদ্যের তাল সামলে এগুলাম ···চিপ চপ ইত্যাদি সব, চুপচাপ ফাউল রোস্‌টের তলায় দাগ মেরে দিলাম ওর হাতে ছেড়ে—'এইটেই আনো আগে।'

রোস্‌টের ফরমাস দিয়ে রেস্‌ট নিচ্ছি···নিচ্ছি তো নিচ্ছিই।

ফেরার নাম নেই নিবারণের। এতক্ষণ ধিকিধিকি পেটের ধুনী জ্বলছিল। এতক্ষণে বেড়া আগুনের ন্যায় দাউ দাউ জ্বলতে লেগেছে। কোথায় নিবারণ!

মুর্গিহাটার দিকে মুর্গি আনিয়ে জবাই করে কাবাব বানিয়ে আনছে নাকি সে?

টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কাগজগুলো নাড়াচাড়া করি। নতুন আর পুরনো খবর কাগজ যতো রাজ্যের!···পাটনায় আকাশ থেকে মাছ পড়ছে, ওধারে মাছের বর্ষণ আর এধারে কলকাতার বাজারে মাছের ছিটেফোঁটাও নেই—সে খবরটাও সেই সঙ্গে দেওয়া।···

কলকারখানায় ধর্মঘট। ধর্মতলায় কর্মখালির খবর!···

নিবারণ ফিরে এল তালিকা হাতে। আমার সামনে পেনসিল দিয়ে কেটে দিল রোস্‌টের নাম—তার তালিকা থেকে।

'নেই ভাই। কেটে দিলুম এই। ফুরিয়ে গেছে আমার রোস্‌ট।'

'বেশ। তাহলে নিয়ে এস তোমার সেই ব্রেস কাটলেট, বেস্‌ট চীজ। তাই খাবো।'

চলে গেল নিবারণ। দাগমারা তালিকা হাতে।

বসে আছি। পড়ছি খবরের কাগজ···পণ্ডিত নেহরুর পায় কড়া পড়েছে। ম্যাট্রিকে অংকের প্রশ্ন দারুণ কড়া হয়েছে এবার। পরীক্ষার হলেও বেজায় কড়াকড়ি।

পড়তে পড়তে, পণ্ডিতজীর পায়ে কড়া পড়ার কথাটা ভাবি। গরম কিম্বা ঠাণ্ডা কী ছিল কড়াটা কে জানে! তা তাঁর পায়ে সেটা পড়তে গেল কেন? হাতে ধরে রাখবার শক্তি ছিল না

নাকি ? না থাক্, কড়াটা তাঁর হয়ে ধরবার লোক ছিল না কেউ ? সে কী !

কড়াটার কোন চাকরির উমেদারি ছিল কিনা কে জানে। নইলে অমন করে তাঁর পায়ে পড়তে যাওয়া কেন ?

'না ভাই, কাটলেটও নেই !' নিবারণ এসে জানায়—'ফুরিয়ে গেছে সব। ভারী কাটতি আমার কাটলেটের।'

সঙ্গে সঙ্গে তালিকার থেকে কাটলেটের নাম কাটা পড়ে।

তালিকাটা তার হাত থেকে নিলাম আবার। তাকিয়ে দেখলাম খুঁটিয়ে। নিজের বেশি ক্ষতি না করে কী কী খাওয়া যায় খতিয়ে দেখি।—'আচ্ছা, একটা মাটন চপ খাওয়া যাক্ কী বলো ? মাটনের চাপ—সইতে পারব তো ?'

'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।' বলে নিবারণ ফের খুঁৎ খুঁৎ করে—'তবে তোমার কথা কইতে পারি। তোমার তো ভাই শরীর নয়, কলেবর।' বলে সে চলে যায়।

আবার মন দিয়ে পড়ছি কাগজ···কবেকার যে, কে জানে !··· আগ্রার নাপিতরা কামাতে রাজি হয়। বিদেশী টুরিস্টদের বেজায় নাকি আগ্রাগতি···কলকাতায় পশ্চিমারা এসে বেশ কামায়—দাড়ি নয়, টাকা। আমাদের টাকাকড়ি যে কোন্ দিক দিয়ে উড়ে যায় টের মেলে না—আমি না-কামানো গালে হাত দিয়ে ঠাওরাই।

নিবারণ এসে হাজির—খালি হাতে।—'না, মাটনও নেই, ফুরুৎ ! পাঁঠন্ আনবো ?'

'পাঁঠা ? পাঁঠন্ চপ ? তাই আনো।'

মাটন চপের নাম কাটন গেল তালিকার থেকে। মাটন কেটে পাঁঠন্ আনতে ছুটলো সে।

আবার আমার কাগজ পাঠ। কোথায় যেন ব্যাঙ পড়তে পাচ্ছে না, উড়ে যাচ্ছে প্লেটে প্লেটে। এদেশের ব্যাঙ বিদেশে গিয়ে ডলার আমদানি করছে বেজায়। ব্যাঙ্ককে লড়াই। টাকা ব্যাংকে জমান—বিজ্ঞাপনটাও দেখলাম।

বহুৎক্ষণ বাদে ফেরৎ এল নিবারণ। 'না, নেই। তোমার পাঁঠন্‌ও নেই।' জানালো এসে পত্রপাঠ।

'দাও আমায়।' তালিকাপত্রটা ওর হাত থেকে নিই—'এবার আমি নিজে কাটি।' তালিকার পিঠে পাঁঠার চপের ওপর পেনসিলের কাটারি বসাই। কেটে দিই ভালো করে। ঘিজিমিজি করে। বেশ ভালো কালো করে তালিকার থেকে তালাক্‌ দিই।

'ভারী কাটতি ভাই আমার দোকানে।' কৈফিয়তের সুরে সে বলে।

'তাই আমিই কাটলাম—আমার হাতেও কিছু কাটতি হোক।'

'ভালোই করেছো—তবু যা হোক একটু বউনি হলো তোমার হাতে।' বলে আমার হাতের থেকে তালিকাটা নিলো।

'কী আছে তোমার রেস্তরাঁয় তাহলে?' পেটের জ্বালায় আমি বলে উঠি—'পটাটো চপ? পটাটো চিপ? দোপেঁয়াজি? এক পেঁয়াজি? আর কিছু না থাকে। তোমার পেঁয়াজিই কিছু ছাড়ো না হয়।'

'দেখি কী আছে, দাঁড়াও।' বলে ফের সে উধাও।

তার কথায় অবশ্যি আমি দাঁড়াইনে। বসেই থাকি। বসে বসেই হাতে পায়ে খিল লাগার যোগাড়। এর পর ফের দাঁড়াতে হলেই হয়েছে! মাথা ঘুরেই পড়ে যাব কি না কে জানে।

আবার পড়াশুনায় মন দিই। খিদেটা ভুলে থাকা যায় যতক্ষণ। কাগজচাপা দিয়ে নিবারণ করা যায় যতটা···

কালোবাজারে বেজায় দর—পড়ি খবরের কাগজে। ভালো জিনিসের কদর নেই। জিনিসের দর চড়ছেই। লেখাপড়ার চর্চা কমছে। শিলচরের এক ছাত্রী তার মাস্টারণীকে কিল চড় বসিয়েছে জানা গেল।

নিবারণকে চপেটাঘাত করলে কেমন হয়? ওর পটাটো চপের এক ঘা? কসে ওর মুখের ওপর বসাই যদি?···

এবারে কতকগুলো কিশোর পত্রিকা নিয়ে পড়লাম···

সম্পাদকের কাছে পাঠানো সব কবিতা অমনোনীত। সন্দেশ মৌচাক শুকতারা—সর্বত্র সমান তাড়না আমার। সুখ নেই কোনো-খানে। সব ধাঁধার উত্তর আমার—রং। এমনকি রোশনাই—রং-মশালেরো। কেউ নাম ছাপায় না। নাহক এদের গ্রাহক হওয়া—দেখছি এখন।

এত রং নম্বরের ওপর নিবারণ এসে ঢং করে দাঁড়ায় সামনে। খালি হাতে। একেবারে হাত খালি না—পেনসিল আর খাদ্যতালিকাটি রয়েছে। 'ভারী দুঃখের বিষয় ভাই—' মুখ ভার করে শুরু করে সে।

'কিছু বলতে হবে না। কাটতির কথা জানা আছে আমার। তোমার খাদ্যতালিকার তলায়—সরবতের তলায়—আমার নামটা লেখো দেখি এবার···'

'তোমার নাম?' সে অবাক হয়ে চায়।

'লেখো না, বলছি তোমায়। যা বলছি···'

লেখে সে—বেশ নারাজ হয়ে।

'কিন্তু আমার খাদ্যতালিকায় তোমার নাম কেন?' আপত্তির সুর শুনি, 'তোমার নাম লিখব কেন? তুমি কি একটা খাদ্য?' লিখতে লিখতে বলে।

'না হয় অখাদ্যই হলাম! লিখতে কী তোমার?'...আমি কই—যত অখাদ্যই হই, খেতে তো পাচ্ছে না কেউ। লেখো তুমি।'

নিবারণ লিখলো।

'এইবার কেটে দাও—বেশ করে—তোমার পেনসিল দিয়ে।' আমি বলি: 'বেশ ভালো করে কাটো।'

'তার মানে?'

'তার মানে—আমিও আর নেই এখন।'

নিবারণ কাটে একটুও দ্বিধা না করে। এতদিন ধরে খাদ্যাখাদ্যের কাটাকাটতিতে—ওর হাত বেশ বাধ্য হয়েছিল তো।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও কেটে পড়ি...গড়গড় করে।

আমারও কাটতি হয়ে যায়—দেখতে না দেখতেই।

দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ

'দাদা! অনেকদিন আমরা দেশছাড়া। যাব একবারটি দেশে?' গোবর্ধন সাধলো দাদাকে।—'দেশের জন্য ভারী মন কেমন করছে আমার।'

'দেশ আবার কোথায় রে?' জবাব দিলেন দাদা: 'যেখানে রয়েছি এখানটা কি আমাদের দেশ না? সারা ভূভারতই তো আমাদের দেশ।'

'তা তো জানি। কিন্তু স্বদেশ বলে একটা কথা নেই? যেখানে জন্মেছি বড়ো হয়েছি খেলাধুলা করেছি সে দেশকে বড় হয়ে ফিরে দেখবার সাধ হয় না একবার? এই ভূভারত তো সবার দেশ। আমার কিসের আপন! আমাদের দেশের জন্য মন কাঁদছে দাদা।'

'সে দেশ কি আর আছে রে? কবেই নিরুদ্দেশ হয়েছে। সেখানে গিয়ে কাউকেই তুই চিনতে পারবি না! তোকেও কেউ চিনবে না। সব নিশ্চিহ্ন। কি করবি সেখানে গিয়ে? পাত্তা পাবিনে কোথাও।'

'তবু একবারটি যাব। যাই-না দাদা?'

'তবে যা। আর যাচ্ছিস যখন, একটা কাজ সেরে আসিস্ আমার। আমি তো কাজের মানুষ, সময় নেইকো কোথাও যাবার। তুই যখন যাচ্ছিসই, স্বামিজীর কাছে আমার ঋণটা

শোধ করে আসিস্ এই সুযোগে।'

'স্বামিজীর ঋণ? স্বামিজীর কাছে তুমি আবার ধার করলে কবে গো!' অবাক হয় গোবরা।

'আহা, টাকা কড়ির ধার কি আবার ধার নাকি একটা? ও তো টাকা ফিরিয়ে দিলেই তা শোধ হয়ে যায়।' দাদা কন: 'সে-ঋণ নয় রে, এ ঋণ অপরিশোধ্য।'

'শুনি কী ঋণ? তোমার এ-ধার আবার কেমন ধারা?' জানতে চায় গোবরা।

'যাবার আগে জানিয়ে দেব তোকে। তবে এইটুকু কই এখন, সেবারে পা ভেঙে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গিয়ে পড়েছিলুম না বেশ কিছুদিন? তখন এক স্বামিজী এসে, অযাচিতভাবে ধর্ম-শিক্ষা দিতেন। কেবল আমাকে না, আমাদের সব রুগীকেই। সেই শিক্ষার ঋণ শুধতে হবে আমায়।'

'এই কথা! তা দেব শুধে। সুদে আসলে। কী করতে হবে বোলো আমায়।'

'বলবো রে বলবো। অঢেল টাকাও দেব সেইজন্যে। অনেক টাকার দায় চাপিয়ে দেব তোর মাথায়।'

গৌহাটি ইস্টিশনে নেমে গোবরা দেখল যে দাদার কথাটাই খাঁটি। তার দেশ কোথায় নিরুদ্দেশ! প্ল্যাটফর্মের এধার থেকে ওধার অব্দি দু দুবার চষে গিয়েও চেনাজানা একজনেরও সে উদ্দেশ পেল না।

এমনকি, স্টেশনটাকেই যেন অচেনা মনে হয়। যে গৌহাটি স্টেশনে উঠে তারা কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিল তার চেহারাটাই পালটে গেছে। আরো অনেক লম্বা চৌড়াই যেন এখন। তবু

ওরই মধ্যে একজনকে একটুখানি চেনা চেনা বলে তার ঠাওর হলো। প্ল্যাটফর্মের একধারে বসে একমনে সে জুতো সেলাই করছিল।

তার কাছে গিয়ে শুধালো—'হারুদা যে! চিনতে পারো আমাকে?'

'এই যে গাবু ভায়া! চিনবো না তোমাকে, সে কি কথা! আমার চোখের ওপর এত বড়োটা হলে! এই সাত-সকালে উঠে চলেছো কোথায় শুনি?'

'যাব কি গো? এলাম যে! এই ট্রেনটাতেই এলাম তো!'

'ট্রেনে এলে!' হারু হতবাক্—'গেছলে কোথায় এর মধ্যে গো?'

'কলকাতায়। সেখানেই ছিলুম তো অ্যাদ্দিন! ওমা! তুমি কিচ্ছু খবর রাখো না! অবাক করলে হারুদা!'

'কলকাতায় ছিলে নাকি অ্যাদ্দিন? কই জানি নে তো কিচ্ছু। কেউ বলেনি আমায়। যা দিনকাল, কারুর খবর কেউ রাখে না ভাই! ফুরসৎ কই খবর রাখার—তাই বলো।'

গোবর্ধন সায় দিলো—'যা বলেছো। তা হারুদা, তুমি কি আজকাল ইস্টিশনে এসেও তোমার কাজ করো নাকি?'

'না করলে চলে না ভাই! যা দিনকাল পড়েছে না, ঘরে বসে রোজগারে কুলায় না। এই, বড়ো বড়ো মেল গাড়িগুলো যাওয়া আসার সময়টায় আসি কেবল। গাড়ি তখন বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়ায় তো। যাত্রী বাবুরা সেই সময়টায় জুতো পালিশ করিয়ে নেয়, তাড়াহুড়ার মুখে কম মেহনতে বেশি উপায় হয়ে যায়।'

'তাই বুঝি? আচ্ছা, কলকাতা যাবার আগে আমার জুতো-জোড়া মেরামত করতে দিয়ে গেছলাম, বছর সতেরো আগেকার

কথা, মনে আছে তোমার ?'

'এই তো সেদিন ! মনে থাকবে না ?'

'সারানো হয়েছে নাকি ? তুমি বলেছিলে আর দিন দুই বাদ এসে নিয়ে যেতে···এতদিনে হয়েছে নিশ্চয় ?'

'নিশ্চয়। এতদিনে সারানো হবে না, বলো কি গো ?' হারু আশ্বাস দেয়। 'চলো-না, দিয়ে দিচ্ছি এখনই তোমায় হাতে হাতে।'

ইস্টিশন ছেড়ে বেরুলো দুজনে।

'ইস্টিশনের এ রাস্তাটা তো বড়ো রাস্তাই ছিল জানি, কিন্তু এখন আরো যেন বেশ বড়ো হয়েছে মনে হচ্ছে।' গোবরা বলে।

'শুধু এইটে ? অনেক বড়ো বড়ো রাস্তা হয়েছে এই এলাকায়। এই শহরে। সে শহর আর নেই রে ভাই ! দুদিন বাদ এলে চেনাই দায়।'

'আরে, এইখেনে কোথায় যেন আমাদের বাড়ি ছিল না ?' না দেখে চমকে ওঠে গোবরা : 'গেল কোথায় বাড়িটা ?'

'বেওয়ারিশ পড়েছিল তো এতদিন। মুন্সিপালী তোমাদের বাড়িটা আর তার লাগাও আর সব বাড়ির দখল নিয়ে ভেঙেচুরে এই রাস্তাটা চওড়া করেছে।'

'তাহলে এখন উঠবো কোথায় গো ?'

'জলে পড়েছো নাকি ? আমার বাড়িতেই উঠবে না হয়। তার কী হয়েছে ?'

'তোমাদের পরিবারে ক'জনা ? আমি আবার বাড়তি বোঝা হবো না তো গিয়ে ?'

'সব মিলিয়ে আমরা একান্নজন। একান্নবর্তী পরিবার আমাদের।

যেখানে একান্নজনের মাথা গোঁজার জায়গা হয়েছে সেখানে তোমারও ঠাঁই হবে ভাই। আর ক'দিনের জন্যই বা!'

'এবার অবশ্যি দিন কয়েক।' গোবরা জানায়ঃ 'তবে যে কাজের জন্যে এসেছি না, সেটা সমাধা হলে তারপরে দাদাও আসবেন আবার একবারটি। তাঁকেও আসতে হবে। তবে ঐ কয়েকদিনের জন্যেই।'

'তার কী হয়েছে? বললাম না, আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। যাঁহা একান্ন তাঁহা বাঁহান্ন, যাঁহা বাঁহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।'

'তা বটে।' যেতে যেতে ওদের কথা হয়—'তা হারুদা, এই রাস্তারই কোন গলিতে যেন আমিনাবিবিরা থাকত না! তাদের বাড়ির পিছনে বেশ কয়েকটা পেয়ারা গাছ ছিল, খাসা পেয়ারা! ইস্কুলে যাবার পথে পেড়ে খেতুম আমরা।'

'এ তল্লাটে তারা নেইকো আর। এখানকার সব বেচেবুচে শহরের ওধারে গিয়ে তারা বাসা বেঁধেছে এখন।'

'পেয়ারা বেচে সংসার চলত তাদের। ভারী গরিব ছিল তারা...'

'গরিব বলতে! আমিনাবিবির খসম্ সেই পেয়ারা খাঁ মারা গেলে তাকে গোরস্থানে নিয়ে কবর দেবার পয়সা জোটেনি...'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ ভাই। তাই বাধ্য হয়ে বাড়ির পিছনটায় পেয়ারা গাছ-গুলোর গোড়াতেই তাকে গোর দেওয়া হয়েছে।...আর, বিধাতার কী লীলা! সেই গোর দেওয়ার থেকেই...সেইখানেই গোড়া! এত যে গরিব ছিল আমিনাবিবি না...।'

'দাদা বলছিল সেই কথাই। যাচ্ছিস যখন তখন মনে করে

আমিনাবিবিকে যদি কিছু সাহায্য…'

'তা দিতে পারে সে সাহায্য। কিছু কেন, বেশ কিছুই সে দিতে পারে এখন। চাও না গিয়ে তার কাছে।' হারু বাতলায়।

'তার কাছে গিয়ে চাইব কি? তাকেই কিছু দিতে বলেছে দাদা। দিয়েও দিয়েছে আমার সঙ্গে।'

'তাদের আবার দেবে কি গো? তাদের কি সেদিন আছে আর? বললাম না যে পেয়ারা খাঁর সেই গোর দিতে গিয়ে—সেইখানেই গোড়া! সেই থেকে বরাত ফিরে গেল তাদের। শাবলের ঘায় ঠন করে উঠে মাটি চাপা মোহরের ঘড়া বেরিয়ে পড়ল। সেই থেকেই তারা বড়লোক। শহরের বড়লোকদের পাড়ায় বাড়ি কিনে ছেলেমেয়ে সব নিয়ে সুখে রয়েছে এখন আমিনাবিবি।'

'বাঃ বাঃ! খুব ভালো খুব ভালো!' গোবরা আনন্দে গদগদ। 'কিসের থেকে কি করে কার বরাত ফিরে যায় কেউ বলতে পারে?'

'তা এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে কিরকম বরাত ফিরল তোমাদের শুনি তো?' হারু শুধায়, 'টাকা কামাতেই তো যাওয়া কলকাতায়। তাই না?'

'আমিনাবিবির মতন অমন না হোক, হয়েছে কিছু কিছু।'

গোবরা বলে: 'দাদা একটা কারখানা ফেঁদেছে—কাঠ চেরাইয়ের কারখানা…সেখানে যত আসবাবপত্তর বানায়।'

'ভালোই করেছো তোমরা। চাকরি বাকরি বড় একটা মেলে না ভাই আজকাল। ঘরে ঘরেই আজকাল ছোটখাট কারখানা দেখতে পাবে। এমনকি আমারটাকেই তুমি একটা জুতো সেলাইয়ের কারখানা বলে ধরতে পারো। বললেই হয় কারখানা। বাধা কি?'

'হ্যাঁ, বললে কিছু বেজুত হয় না।' যুতসই জবাব গোবরার: 'তবে আমাদের এমন একালে কারখানা নয় গো! কত জনা কাজ করে সেখানে। বিরাট এক শেডের তলায়…।'

'শেড কি?'

'করোগেটের শেড। ছাদ বলেই ধরতে পারো। সবাই আমরা সেখানে এক পরিবারের মতই…অতোলোক—সব! এক শেডের তলায়।'

'আমাদের পরিবারটাই বা কম কিসের! আমি, আমার বৌ, আমার শালী, কাচ্চাবাচ্চারা সব, গোরু বাছুর, ছাগল ভ্যাড়া, খচ্চর, ঘোড়া, কুকুর বেড়াল। হাঁস মুরগি, তার ওপর…নেংটি ইঁদুরদের কথা বাদই দিচ্ছি…সব মিলিয়ে পঞ্চাশজনার ওপর। সবাই আমরা এক ছাদের তলায়। একান্নবর্তী পরিবার, বললাম না?'

'এক ছাদের তলায়—তার মানে?'

'মানে, এক ঘরের ভেতরে। একটিই তো ঘর। আর ঘর কই আমাদের?'

'গোরু ভ্যাড়া সব নিয়ে একসঙ্গে থাকো?'

'মিলে মিশে বেশ আছি। নেংটি ইঁদুরদের আমি ধরছি না অবিশ্যি। তারা তেমন মিশুকে নয়।'

'আর তোমার কারখানা? জুতো সেলাইয়ের?'

'বাড়ির উঠোনে। আবার কোথায়?'

যেতে যেতে পথের মাঝে থমকে দাঁড়ায় গোবর্ধন—'মনে পড়েছে। মনে হচ্ছে এইখানে ছিলো আমাদের ইস্কুল বাড়িটা। প্রাইমারি ইস্কুলের…।'

'মনে পড়ছে তোমার?'

'পড়বে না ? কান ধরে কতোদিন দাঁড়িয়েছিলাম বেঞ্চির উপরে। কোথায় গেল সেই ইস্কুল ? গেল কোথায় ?'

'ওপর দিয়ে রাস্তা কেটে বেরিয়ে গেছে—দেখছ না ?'

'তা তো দেখছি। রাস্তাই তো বাড়ি-চাপা পড়ে জানতাম, উলটে বাড়িও যে রাস্তা-চাপা পড়ে দেখছি এখন।'

বলতে বলতে তারা হারুর আস্তানায় এসে পড়ল। উঠোনে উঠে গোবরা বলল—'এই তো তোমার সেই কারখানা হারুদা ? এইখেনেই বসি কোণের এই মোড়াটায়। এই কারখানায় বসেই তোমার কাণ্ড দেখা যাক।'

'কাণ্ড আর কী দেখবে ভাই! কাজটাজ আজকাল আর তেমন নেই! সেইজন্যেই তো উপরি উপায়ের আশায় ইস্টিশনে যাওয়া।'

'আমার জুতো জোড়াটাই নিয়ে এসো দেখা যাক। বানানো হয়ে রয়েছে বললে না ? সেইটেই তো প্রকাণ্ড। তাই দেখি।'

হারু ঘরে ঢুকে আনাচে কানাচে খুঁজে পেতে নিয়ে এলো জোড়াটিকে—'এই নাও।'

'ও মা!' এ যে কিচ্ছুই সারাওনি গো। তেমনিই রয়েছে…'

'দুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে'খন। তুমি তো দুদিন রয়েছো হে এখন।'

'সেবারও তুমি ওই কথাই বলেছিলে—দুদিনের ভেতর সারিয়ে দেবে। এখনো তোমার মুখে সেই দুদিন ?'

'লাগলে ঐ দুদিনই লাগে, বুঝেচ ভাই ? তবে ঐ লাগাটাই মুস্কিল। এই আর কি! এত ব্যস্ত কিসের! সুস্থির হয়ে বোসো এখন, চা-টা খাও। ভালো করে দেখি তোমায়।'

ভালো করে দেখতে গিয়ে হারুর চোখ ছানাবড়া।

'তোমার মুখটা আগের চেয়ে ঢের চকচকে হয়েছে দেখছি। ইস্নো পাউডার লাগিয়েছ বোধহয়!...তা বেশ, তা বেশ!...' মুখের পর তার চুলের চাকচিক্যে নজর পড়ে: 'উ বাবা! তোমার চুলের বাহারও তো কম নয় হে! কলকাতার হাওয়া লেগে মাথার ভোল পালটে গেছে...' গোবরার শীর্ষস্থানের দৃশ্য তার চোখ কেড়ে নেয়—'বাঃ, দিব্যি টেরি বাগিয়েছো দেখছি। এখানে থাকতে তো কই তোমার টেরি-ফেরি দেখিনি কোনোদিন! ও বাবা! গায়ে কী আবার! এ তো সিলক্ নয় ভাই, প্রায় সিলকের মতই যদিও...কী বললে, টেরিলিন? নয়া বিলিতি আমদানি? কলকাতার হালের ফ্যাশান এই বুঝি?'

গোবরার আগাপাশতলা খুঁটিয়ে মাথার থেকে পায়ের পাতায় সে তলিয়ে দেখে—'অদ্ভুত কাটছাঁটের এ জুতো কোথাকার হে! এ তো এখানকার না—আমার বানানো নয়ত! কী বললে? চীনে বাড়ির জুতো, টেরিটি বাজারে কেনা?'

টেরিলিন টপ্‌কে মাথার থেকে পায়ের টেরিটি পর্যন্ত বুলিয়ে হারুদার চোখ একেবারে ট্যারাটি!

'বাঃ, ডবোল টেরিটি বাগিয়ে বসেছো দেখছি। বেশ বেশ।' হারু বলে: 'আমাদের গাবু যে গাবুরনর হয়ে গেল গো! একেবারে লাট সাহেব।'

এই আলোচনার ফাঁকে একটা মুরগির বাচ্চা কোঁকর কোঁ করতে করতে কোত্থেকে ছুটে এসেছে...

'তোমার পরিবার ভুক্ত একজন? তাই না হারুদা? একান্নবর্তীর এক?'

'না। ভুক্ত হয়নি এখনো। তবে একান্নবর্তী পরিবারের একজন তা ঠিক। আজ পরিবারভুক্ত হবে।'

'আজ হবে? তার মানে?'

'মানে, তোমার খাতিরে ওকে কেটে খাব আজ আমরা। তাই বলছিলাম।'

'তোমার পরিবারের একজন কমে যাবে তো তাহলে?'

'বাড়লোও তো একজনা। তোমাকে নিয়ে সেই একান্নই রইলো।' হাসতে থাকে হারু।

'আমি আর কদিন এখানে! দাদা তার কাজের যে-বরাত আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে সেটার ব্যবস্থা করেই চলে যাব এখান থেকে—দু'একদিনের মধ্যেই।'

'ভালো কথা। তোমার দাদার কথাটাই তো জানা হয়নি এখনো! কি কারণে এখানে তোমার আসা তাই তো এখনো বলোনি ভাই!'

'বলছি শোনো। গোড়ার থেকেই বলি সব। হয়েছিল কি, গত বছর দাদার আমার একটু পদস্খলন হয়েছিল…'

'ওরকম হয়। কারু কারু হয়ে থাকে বুড়ো বয়সে। হলে ভারী মারাত্মক। সহজে জোড়া লাগে না। ভাঙা বুক ভাঙাই থেকে যায়। যাকে বলে গিয়ে ঐ—ভগ্নহৃদয়।'

'না গো, বুক টুক নয়। পড়ে গিয়ে একটা পা ভেঙেছিলেন দাদা। কাছাকাছি এক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পায়ে প্ল্যাস্টার লাগিয়ে হাসপাতালে পড়েছিলেন দিন কতক।'

'তাই নাকি? তাহলে সে অন্য কথা।'

'সেই অন্য কথাই। সেখানে এক স্বামিজী, ওঁদের ঐ মঠেরই,

রোজ বিকেলে ধর্মশিক্ষা দিতে আসতেন রুগীদের। দাদাকেও দিতেন। সেই থেকে দাদা সর্বধর্মসমন্বয় সমন্বয় করে প্রায় ক্ষেপে উঠেছেন।'

'সর্বধর্মসমন্বয়টা আবার কী ব্যাপার? শুনিনি তো কখনো।' হারুর কাছে কথাটা নতুন ঠ্যাকে।

'মানে হিন্দু মুসলমান পার্শী ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ জৈন সব ধর্মই এক। এমন কিছু করতে হবে যেখানে সবাই এক হয়ে সমান সমান মিলতে মিশতে পারবে—ধর্মকর্ম করতে পারবে এক সাথে। পরমহংসদেবের সেই সর্বধর্মসমন্বয়ের জন্য দাদার এখন প্রাণ কাতর।'

'কিন্তু এ তো দু-চারদিনের কম্মো নয় দাদা! তুমি বলছ দুদিন থাকবে এখানে, তাতে কি করে হয়?'

'কলকাতায় আমাদের কাজ না? অঢেল কাজ। দাদা কি পারে একলাটি? দাদার কাছে আমারও থাকার দরকার যে!'

'তাহলে কী করে হয় ভাই? সমন্বয় বলে কথা, তাও আবার সর্বধর্মের। মন্দির মসজিদ গীর্জা কতো কী বানাতে হবে। কতো কাঠখড় পুড়বে। মিস্ত্রি মজুর খাটবে কতো। কতো ইঞ্জিনীয়ার কণ্ট্রাক্টারের দরকার। টাকাও কতো লাগে কে জানে!'

'টাকার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। লাখ টাকার একটা সেলফ চেক কেটে দাদা আমার সঙ্গে দিয়েছে। সেটা আমি তোমার নামে এখানকার কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউণ্ট খুলে দিচ্ছি না হয়। তারপর আরো যতো লাগে পাঠাবে দাদা। তুমি এই সব মিস্ত্রি মজুর ইঞ্জিনীয়ার কণ্ট্রাকটার নিয়ে এর তদারকির ভার নিতে পারবে না?'

'পারব না কেন? এই মুল্লুকের যতো ইঞ্জিনীয়ার কণ্ট্রাকটার

সব আমার চেনা। তাদের মাথা আমার কেনা না হলেও তাদের পায়ের জুতো আমার থেকেই কেনা। তাদের হাত পা বাঁধা আমার কাছে। আমার কথায় রাজি হবে সবাই। আমার অবসর মত তাদের দিয়ে একাজ আমি ভালোই করতে পারবো। তাছাড়া, পুণ্য কাজও তো বটে।'

'তাহলে তার ব্যবস্থা করো আজকের মধ্যেই। আমি যেন রাতের ট্রেনেই ফিরতে পারি কলকাতায়। এখন ব্যাংকে চলো, তোমার নামে চেকটা জমা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে দিই গে।'

হারুর নামে লাখ টাকাটা ব্যাংকে দিয়ে সেদিনই গোবরা কলকাতায় ফিরে গেল।

সর্বধর্মসমন্বয়-মন্দির বানানোর ভার নিল হারু।

ঠিক হলো, এই এলাকার যে জায়গায় সাপ্তাহিক হাট বসে, দূর দূরান্ত থেকে কেনাবেচা করতে আসে যতো লোক, হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান পার্শী সব্বাই—সেই হাটের মাঝখানেই হবে এই মন্দিরটা।

আগামী রথযাত্রার দিনে দাদা হর্ষবর্ধন এসে সেই সমন্বয় মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন ঠিক রইল।

রথযাত্রা তিথির যথাদিবসে হর্ষবর্ধন ভাইকে নিয়ে যথাস্থানে হাজির। সর্বধর্মসমন্বয় মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন।

'হারুদা, ঐ লাখ টাকাতেই তোমার মন্দির-ফন্দির গড়া হয়ে গেল সব? লাগলো না আর? লাগবে না আর?'

প্রথম দর্শনেই হর্ষবর্ধন চেক বই খুলে তৎপর।

'না না! আবার কিসের লাগবে! ঐ টাকাতেই হয়ে গেছে

সমস্ত। কয়েক হাজার বেঁচে গেছে বরং। যারা ওর দেখা শোনা করবে, চালাবে, ঐ টাকার সুদে, তাদের বেতন বাবদে চলে যাবে। আর কিছু দিতে হবে না তোমাদের।'

'চলো, বাজারে গিয়ে ধর্মস্থানটা দেখে আসি আগে।' হর্ষবর্ধন কন: 'আমাকে আবার মন্ত্রিদের মতন দ্বারোদ্ঘাটন করতে হবে তো!'

'মন্ত্রিদের মতই তোমার জন্যেও আমি ফটোগ্রাফার মজুদ রেখেছি তাই। কিছু ভেবো না ভাই। শহরের সেরা ফটোগ্রাফার।'

বাজারে গিয়ে হর্ষবর্ধন তো হতবাক্!

বাজারের মধ্যিখানে বৃত্তাকারে সারি সারি পায়খানা!

'এ কী! হারুদা, মন্দির কই! আমার সমন্বয় মন্দির? এ তো কেবল পায়খানা দেখছি দাদা।'

'প্রথমে ভেবেছিলাম যে মন্দির বানাবো। শিবমন্দির। তারপর ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিক হবে না। সেখানে কেবল হিঁদুরাই আসবে, মুসলমান ক্রিশ্চান এরা কেউ ছায়া মাড়াবে না তার। মসজিদ গড়লেও সেই কথা। মুসলমান ছাড়া আর কেউই ঘেঁষবে না তার দরজায়। গির্জা হলেও তাই। যাই করতে যাই, সর্বধর্ম-সমন্বয় আর হয় না। তাছাড়া, পাশাপাশি মন্দির মসজিদ গির্জা গড়লে একদিন হয়ত মারামারি লাঠালাঠিও বেধে যেতে পারে। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে এই পায়খানাই বানিয়েছি। সবাই আসছে এখানে। আসবে চিরদিন। হিন্দু মুসলমান জৈন পার্শী ফেরেস্তান। কেউ বাকী থাকবে না। বলে দম নেবার জন্য হারু একটুখানি থামে।

'এধারের আদ্ধেকজুড়ে ঐ পায়খানাই। আর ওধারে আদ্ধেকটা-

জুড়ে বসিয়েছি এক পাইস হোটেল। হাটে চাজারে যারাই আসে সস্তায় যেন তারা দুমুঠো খেতে পায়…।'

'এধারটা পাইখানা, আর ওধারটায় তোমার খানা পাই? এই ব্যাপার?' টিপ্পনি কাটে গোবরা।

'এই দুজায়গাতেই তুমি সব ধার্মিকের মিল পাবে ভাই! আহার করা আর বাহার করা—তাইতেই। সর্বধর্মসমন্বয় এইখানেই। ধর্ম আর কর্ম—দুয়েরই সমন্বয় এখানে। বলো তাই কিনা?'

'যা বলেছো!' বলেই হর্ষবর্ধন মুক্তকচ্ছ হন।

কাছা সামলাতে সামলাতে সামনে যেটা পড়ে সেটার দরজা খুলে সেঁধিয়ে পড়েন শশব্যস্তে।

সারধর্মের দ্বারোদ্ঘাটন হর্ষবর্ধনই করলেন সব প্রথম।

টুকটুকির গল্প

শারদীয়ার অবকাশটা প্রায়ই আমি ঘাটশিলায় আমার ভাইয়ের কাছে কাটাতে যাই।

স্টেশনের থেকে কাছেই ঘাটশিলার ইস্কুল কাম্ কলেজ। আর, তার কাছাকাছি স্কুল-কলেজের হেড মাস্টার ওরফে প্রিন্সিপাল অর্থাৎ আমার ভাইয়ের আস্তানা। তখনো সে অবসর নেয়নি।

বছর কতক আগে সেখানে গিয়ে, বলতে কি, চম্‌কাতেই হয়েছিল আমায়।

ওমা, একী! এত মাইল পেরিয়ে এসেও এই গণ্ডশহরে সেই কলকাতাকেই দেখি যে!

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে বাড়ির রাস্তায় পা বাড়াতেই হাজা-মজা জলাশয়টার পাশে রাস্তার ওপরেই এক মন্দির খাড়া দেখলাম!

এটাকে কই আগে কখনো দেখিনি তো! কবে গজালো?

ভুঁইফোড় ঠাকুরদের নিয়ে রাতারাতি দেবস্থান খাড়া করে মাতামাতি সেই কলকাতার ফুটপাথেই যা দেখেছি। সেই কলকাতাই কি অ্যাদ্দূর অব্দি এসে হামলা করতে লেগেছে নাকি? কী সর্বনাশ!

অতি ক্ষীণ ফুটপাথও ধারে কাছে নেই। সুবিস্তৃত জলাশয়ের পৈঠা ঘেঁষে সদ্যোজাত পীঠস্থানটি দাঁড়িয়ে। ফুটপাথেই যখন

দেবতাদের পদপাত হয়ে থাকে তখন আশা করা যায় অচিরেই এখানে একটা ফুটপাথ গজাতেও দেখা যাবে।

অঘটন ঘটার দিন কাটেনি এখনও। দৈবলীলা সর্বত্রই প্রকট। সকালে যেখানে আজ দেবশিলা দেখে এসেছি সেইখানেই বিকেলে দেবীলীলা দেখা গেল।

পথচাওয়া আমাদের বাড়িটার বারান্দায় বসে রয়েছি। টুকটুকি বই বগলে ফিরলো ইস্কুল থেকে—আফ্রক্‌মস্তক জলে ভিজে জব্‌জব্‌ করছে। তার ওপর শ্যাওলার পলস্তারা জায়গায় জায়গায়। বালিকা শৈবালিকা হয়ে ফিরেছে।

আমি তো তাজ্জব!—'এই অবেলায় চান করেছিস যে? তোর দিদা না দেখতে পায় আবার! দেখলে সিধা করে ছাড়বে।'

ফ্রকটা নিঙড়ে সে জল ঝাড়তে থাকে।

'এই পড়ন্ত বিকেলে চান করতে গেলি যে বড়ো? তোর মা যদি দেখতে পায় না! যা, চটপট ফ্রক্‌টক্‌ বদলে ফ্যাল গে।'

'বন্ধুদের সঙ্গে ইস্কুল থেকে ফিরছিলাম না বড়দাদু? একজনকে যে উদ্ধার করতে হোলো আমায়, করব কী?'

'আমাদের সাত পুরুষ তো উদ্ধার করেছিস! তার বাইরে ফের কাকে আবার উদ্ধার করতে গেলি রে?' অবাক লাগে আমার।

'সেও এক পুরুষ! এখনো পুরোপুরি পুরুষ না হলেও নেহাত বালকও না,—বালক আর পুরুষের মাঝামাঝি।'

'এক নাবালক তাহলে। কী হয়েছিল শুনি তো?'

'ছুটির পর ইস্কুল থেকে ফিরছিলাম না বড়দাদু, বন্ধুদের একটু এগিয়ে দিয়ে ফিরে লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে মন্দিরটার পাশে আসতেই দেখি কি, একটা ছেলে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে

বসেছে··

'তোর নজরে পড়ল বুঝি?' আমি বলি: 'সে-ও নিশ্চয়ই এই ছিপছিপে মেয়েটির ওপর নজর দিতে ভুল করেনি?'

'তাই করতে গিয়েই তো এই কাণ্ডটা ঘটল দাদু···' টুকটুকি কয়: 'যেই না সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে গেছে আমার দিকে, অম্‌নি না ঝপাং! জলের মধ্যে পড়ে গেছে বেচারা।'

'একেবারেই জলাঞ্জলি?' আমি বলি: 'মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলিস ছেলেটার বোধ হচ্ছে।'

'কী যে বলো দাদু। শহরের ছেলে হবে হয়ত, সাঁতার জানে না একদম, ঐটুকুন জলের মধ্যেই নাকানি চুবানি খাচ্ছে দেখে তখন বাধ্য হয়ে···'

'তুইও ঝপাং?'

'আমাকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো, কী করব? চোখের ওপর তো জলজ্যান্ত ছেলেটাকে মরতে দিতে পারি না···'

'জল থেকে জ্যান্ত অবস্থাতেই তুলতে হয়। তা বটে।'

'জলে পড়েও সে মাথা ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিল আমার দিকে···'

'বারবার তুই তার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্ছিলিস বোঝা যাচ্ছে।' আমি বলি—

'মুণ্ডু না ঘুরলে···মুণ্ডু না ঘোরালে বোধ হয় জলে পড়তো না সে।'

'জলে পড়ে সে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে পাছে ডুবে মরে তাই আমায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচাতে হলো শেষটায়।'

'বেশ করেছিস। সামান্য আমার নাতনি হয়ে তুই যে এমন বাঘা মেয়ে হবি তা আমার ধারণা ছিল না।'

'বারে! আমি বাঘা যতীনের নাতনি না?' তোমার মতন বাঘা যতীনেরো তো!'

তাইতো বটে! তখন আমার মনে পড়ে যায়। আমাদের এক ভাইঝি বাঘা যতীনের ঘরেই তো পড়েছিল বটে, তাঁর ছেলে বীরেনের সাথে বিবাহসূত্রে জড়িয়ে গিয়ে। আর আমি···আরে, এই সেদিনও তো, একটা ছড়া লিখে দিয়েছি টুকটুকিকে···

বাঘা যতীন ছিল বাংলাদেশের রাজা,
শিব্রাম ছিল কোন্ ভ্রমে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে
নাতি ও নাতনি মাধ্যমে।

'যাক্ গে, তোকে দেখে যে উলটে পড়েছিল তাকে জল থেকে তুলে সোজা পথে এনেছিস, বেশ করেছিস। কী হলো শুনি তারপর? জল থেকে উঠে প্রাণদানের জন্যে তোকে তার ধন্যবাদ জানালো ছেলেটা?'

'মোটেই না। একটা কথাও কইল না সে। দাঁড়ালোই না একদম্। একবার চার ধারে তাকিয়ে না, ভোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল কোথায়! তাকে আর দেখতে পেলুম না। টিকিই দেখা গেল না তার আর।'

'পাবিও নে আর। মেয়ের হাতে উদ্ধার পেয়েছে একটা ছেলের পক্ষে এটা কম লজ্জার কথা নয়? পাছে সেটা কারো নজরে পড়ে যায় সেই লজ্জায় সে অম্‌নি করে পালিয়েছে। যাক্ গে, যেতে দে! মেয়েদের জীবনে এমন কতই আসে। সারা জীবন ধরে কতজনকে এমনি উদ্ধার করে ডাঙায় তুলতে হয় তাদের। ও কিছু না!'

'গা ধুতে আমি কুয়োতলায় গেলাম।' বলে সে চলে যায়।

খানিক বাদে ওর মা আসেন—'শুনছো কাকু! দিনকে দিন টুকটুকি কী ধিঙ্গি হচ্ছে যে···আজ নাকি একটা ছেলেকে···।'

'জানি। আগেই বলেছে আমাকে। মনে হয় আমাদের মুখ চেয়ে বসে না থেকে নিজেই সে স্বয়ম্বরা হতে এগিয়েছে—'

'কী যে বলো তুমি! মাথা নেই, মুণ্ডু হয় না।'

'এমনি করেই তো হয় রে! ও তো কাজটা আদ্ধেক আগিয়েই রেখেছে, এখন আমাদের কাজ হলো ছেলেটাকে বাগিয়ে এনে ছাঁদনাতলায় খাড়া করে দেওয়া। যা হবার হয়ে গেছে, ওকে এখন আর বকাঝকা না করে স্যাক্‌রা ডাকার ব্যবস্থা করো বরং।'

'তাই হয় নাকি আবার!' বলে ওর মা গুম হয়ে চলে গেছে।

খুকীর মুখের গুমোট দেখে আমায় ভেবে খুন হতে হয়।

ভাবনার কথাই বই কি! অভাবিতের কাল এসে পড়েছে। যা ভাবাই যায় না, কল্পনার অতীত, সেই সবই যেন এখন ঘটে যায়।

চিরকাল ধরে দেখে আসছি, বইয়েও পড়া, জলের মেয়ে উদ্ধারে ছেলেরাই এগিয়ে আসে। তারপরে জল থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেরাই গিয়ে জলে পড়ে, অথই-এ থই না পেয়ে জীবনভর হাবুডুবু খায়, উদ্ধার পায় না আর।

পানি থেকে গ্রহণ করার ফলে সেই মেয়েটিরই পাণিগ্রহণ করতে হয় শেষটায়। এড়ান ছাড়ান নেই তার। যা হবার হয়ে যায়। তাই মাথা পেতে মেনে নিতে হয়।

কিন্তু এখানে কী রকম উল্টোধারা হয়ে গেল না? অবশ্যি এ-যুগটাও পালটানো। উলট পুরাণের যুগই যেন এটা। সেই পুরনো কাহিনীটা এখানে উলটে দেখা দিয়েছে।

ফলে, দাঁড়াবেটা কী তাই ভাবি। ছেলেরা উদ্ধার করলে তারাই পাণিগ্রহণ করত। কিন্তু এখানে মেয়ের হাতে কাজটা হওয়ায় কেমনটা দাঁড়াবে কী জানি! মেয়েরা তো পাণিগ্রহণ করতে পারে না। তারা দয়া করে পাণিগৃহীত হয়ে ছেলেদের অনুগৃহীত করে। কিন্তু এখানে? এ কী বিতিকিচ্ছিরি উল্টোপাল্টা হয়ে গেল।

এর পরিণতিটা পরিণীতায় গিয়ে ঠেকলে হয়।

কিন্তু যাই হোক স্যাকরাকে তো ডাকতেই হবে শেষ পর্যন্ত!

কিন্তু স্যাকরা ডাকার আগেই এদিকে এক ফ্যাকরা বেরিয়ে বসেছে।

ঘাটশিলার মতো অপোগণ্ড এলাকায়, যেখানে একটা ঘাটও আমার চোখে কখনো পড়েনি, কোনো শিলালিপিও কদাচ নয়, সেখানে যে রয়টার মার্কা কোনো রিপোর্টার ঘাপটি মেরে থাকতে পারে তা আমি ধারণাও করিনি।

ইস্কুলের একটা বাচ্চা মেয়ে কলেজের এক ছেলেকে উদ্ধার করেছে রটনা করার মতই ঘটনাটা বটে। এবং সেই সাংবাদিকের সৌজন্যে দেশে দেশে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।

আর তার পরই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

দিল্লী থেকে তলব এলো টুকটুকিকে নিয়ে সেখানে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সনদ নিয়ে আসার।

কে এখন এই হিল্লি দিল্লি করে?

টুকটুকির অভিভাবক বলতে আমার ভাই। সে তার ইস্কুল কলেজ নিয়েই ব্যস্ত। এক মুহূর্ত তার সময় নেই নিশ্বাস ফেলার। বিকল্প বলতে আমি।

দিল্লির দরবারে গেলে দর বাড়ে জানি। কিন্তু এই হিল্লি দিল্লি

করার উৎসাহ আমার হয় না। তার ওপরে এই উন্মাদন-রূপের গন্ধমাদন ঘাড়ে করে! চতুর্দশীর চাঁদ সেই সমুদ্র মন্থনের পরে যেন ষোড়শীতেই উপচে পড়েছে হঠাৎ।

কলকাতার বাইরে আমি কদাচই পা বাড়াই। বাড়ালেও আমার দৌড় ঐ ঘাটশিলা অব্দি। ভূভারত পরিক্রমা করার মতন অত পরিক্রম আমার নেই। দিল্লিকে দূরে রেখে তার লাড্ডুর মত না চেখেই আমি পস্তাতে চাই। দিল্লী দূর-অস্ত! আমার কাছে তিনি সেইরকম সুদূরপরাহতই থাকুন। তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে তাঁকে দুরস্ত করার বাসনা আমার কদাপি হয় না।

কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডায়? নিতান্ত অনীহা সত্ত্বেও ইহা ঘটে যায়। টুকটুকির দৌলতে যাই-যাই দশা হলো আমার।

অবশেষে দেখি, ওকে বগলদাবা করে রাজধানী এক্সপ্রেসে একদিন আমি চেপে বসেছি!

রাজধানীর দরাজ পথে পা দিয়েই আমার প্রাণ খাই খাই করে উঠল। এখানকার না-খাওয়া লাড্ডুর জন্য পস্তাতে লাগলাম।

'ছাখ তো টুকটুকি? আশপাশে কোথাও কোনো লাড্ডু পেড়ার দোকান তোর নজরে পড়ে কিনা। ভালোমন্দ কিছু মুখে না দিলে তো বাঁচিনে ভাই!'

সে মুখ তুলে তাকায়—আমার মুখের দিকে।

'মুখে তো দেবে, এদিকে মুখের কী ছিরি হয়েছে তা দেখেছো? এক মুখ দাড়ি বেরিয়ে গেছে তোমার—এই এক রাত্তিরেই। এক মুখ ঐ নিয়ে রাষ্ট্রপতির সমুখে গিয়ে দাঁড়াবে কি করে গো?'

'তাই নাকি, অ্যাঁ?' গালে হাত বুলোতে হয়—নিজের গালেই।

'তাই তো দেখছি রে! এই পশ্চিম মুলুকের আবহাওয়া এমনি যে রাতারাতি চেহারা ফিরে যায়। শাক-সবজির বাড়ও হয় বেজায়। অবশ্যি, গালের ওপর আমার সবজি আর নেই বোধ হয়, সবটাই এখন শাকাবহ।'

খাবার মাথায় থাক, এখন দাড়িটাকে সাবাড় করা যাক। কোথায় দাড়ি চাঁছা সালুন, নজর চালাই চারধারে।

নাপিত দেখলে যেমন নখ বাড়ে শোনা যায় তেমনি নখ বাড়লেও নাপিতরা নিজ গুণে দেখা দেন বোধ হয়।

নজর দিতেই চোখে পড়ে গেল রাস্তার পাশেই এক সালুন। গোদের ওপর বিষফোঁড়া—বাঙালীর সালুন তার ওপর। বাঙালী পরামাণিক, উত্তমরূপে চুল ছাঁটে ও দাড়ি কামায়—সাইনবোর্ডে স্পষ্টাক্ষরে জানানো।

'এই দাড়ি কামানো-ওলার কাছেই যাওয়া যাক্। কী বলিস? কিছু তো কমাবেই।' বলে আমরা সালুনের মধ্যে সেঁধুলাম।

'ছাখো বাবু, আমাদের এক মুহূর্ত টাইম নাই। চটপট দাড়ি কামিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। রাজধানীতে বিশেষ কাজে এসেছি আজ।'

'আপনাকে বহুৎ বোলতে হোবে না বাবু! রাজধানীর কাজ কামাই, কে না জানে? সবাই ইখানে কুছু না কুছু কামাবার মতলবেই হামেশা আসে। আমি যে এই ক্ষুর কাঁচি নিয়ে বসেছি—আমারো ওই কামাবার মতলব বাবু! কামাইয়ের কাজ আমারও।'

'বেশ বেশ! খুব ভালো। তুরন্ত তাহলে তোমার কাজটা সেরে নিয়ে ছেড়ে দাও আমাদের।'

'দেখুন না বাবু! আমি এক মিনিটে আপনার কাজ সেরে দিব। আমার ক্ষুর যেন রাজধানী এক্সপ্রেস্—বুঝলেন বাবু!'

তারপর আমি তার ক্ষুরের তলায় গাল গলা পেতে দিয়েছি।

দু গালে ক্ষুরের দু পোঁচ না টেনেই সে বলে উঠেছে—'খতম বাবু! হো গিয়া। দেখুন কেমোন হোয়েছে।'

সামনের আয়নায় তো দেখছিলামই, তার পরে গালের দুধারে হাত বুলিয়ে ভালো করে দেখি—

'এ কী কামালে হে! গালের সব জায়গা তোমার ক্ষুরের নাগালই পেলো না তো! একী হলো! দুধারে একবারটি করে টেনে দিলে—বাস্? চারিদিকেই খোঁচা খোঁচা ঠেকছে—রয়ে গেছে দাড়ি। এ কী?'

'বললাম না বাবু, আমার ক্ষুর যেন রাজধানী এক্সপ্রেস। রাজধানী এক্সপ্রেস কি সব জায়গায় দাঁড়ায় হুঁজুর?'

চকরবরতিরা সহজ নয়!

মিত্র, বন্দ্যো, নন্দী আর আমি এই চার জনার আনন্দিত আমাদের আড্ডাটা কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে গেল হঠাৎ।

মিত্র এসে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল সেদিন—'ভাই, আমি আর তোমাদের সঙ্গে বেশিদিন নেই।'

'তার মানে?' আমি জানতে চাইলাম।

'মানে এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে। অনেক দূরে।'

'কোথায় যাচ্ছ শুনি? কবে যাচ্ছ?'

'কোথায় যাচ্ছি কে জানে! তবে যাওয়াটা খুব হঠাৎও হতে পারে হয়ত।'

'খোলসা করে বলোই না আহা!'

'এক্স্‌রে করে টের পাওয়া গেল আজ। আমার ক্যানসার হয়েছে, বলল ডাক্তার।'

বাজফাটা আওয়াজের মতই খবরটা আমাদের স্তব্ধ করে দিল।

'আর, ক্যানসারের কোন আনসার নেই জানো তো? লাং ক্যানস্‌ার। মৃত্যু নির্ঘাত।'

'ওই বিষম ব্যাধি জুটলো-কোথা থেকে তোমার? বংশে ছিল নাকি কারো কখনো?' নন্দী জিজ্ঞেস করে।

'সাত পুরুষে নয়। সম্পূর্ণ আমার স্বোপার্জিত।' পাংশুমুখে

মিত্র জানায়! 'অতিরিক্ত সিগ্রেট খাওয়ার জন্যেই হয়েছে, বলছে ডাক্তার।'

আশ্চর্য নয়! যা চেন্‌স্মোকার ছিল না ও! খালি এই মুহূর্তেই যা দেখা যাচ্ছে না, নইলে সর্বদাই ওকে আমরা ধূমায়িত দেখেছি। একটা ছাড়ছে আরেকটা ধরাচ্ছে—একটা না একটা টেনেই যাচ্ছে হর্দম্। সিগ্রেটের প্রতি এত টান, এমন টানাটানি ভালো নয়, ডাক্তার না হয়েও আমিও তো বলেছি ওকে কতোবার!

কিন্তু এমন ধুমধাম করে সিগ্রেট টানতো না সে! কারো কথায় কান দেবার পাত্রই ছিল না।

আমি ভয় দেখিয়েছি, টি-বি দাঁড়াবে তোমার। সে ভয় খায়নি। বলেছে, টি-বি আজকাল দাঁড়াতেই পায় না। এমন চমৎকার সব আধুনিক চিকিৎসা বেরিয়েছে না! দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই উল্টে পড়ে টি-বি! মানুষকে পালটে ফেলতে পারে না। সে ভরসা দিয়েছে আমাকে।

কিন্তু তোমার ওই সিগ্রেট না খেয়ে, কেবল তার ধোঁয়া খেয়েই আমার এই হাঁপানি ধরে গেল ভাই! বলেছি আমি। সত্যি, সে সিগ্রেটে দম দিতে শুরু করলেই এমন বেদম কাশি আমায় পেয়ে বসত যে তা বলবার কথা নয়।

সে প্রধূমিত হলেই আমি প্রকাশিত। তাকে সিগ্রেট হাতে নিতে দেখলেই আমি সাত হাত পিছিয়ে গেছি। খানিকটা নিঝুম থাকার পর সে ফোঁস করে উঠল হঠাৎ: 'নাঃ, ভাবব না। মৃত্যু তো আছেই। সবারই আছে। সবারই হবে। দুদিন আগে আর দুদিন পরে। তার জন্যে ভাবব না। তবে মরার আগে সবার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে যেতে হবে। নইলে ভগবানের সামনে গিয়ে দাঁড়াব কি করে? কী

কৈফিয়ৎ দেব ?'

'কোনো পাদ্রীকে ডেকে আনতে বলছ ?' আমি শুধাই : 'কোনো কিছু কনফেস-টেস করার আছে ?'

'না না। পাদ্রী কী করবে। পাদ্রীর সঙ্গে কোনো দিনই কোনো সম্পর্ক নেই আমার। কখনো কি ধর্মকর্ম কিছু করেছি, না গীর্জায় গেছি! যদি তা করতাম তাহলে হয়তো আজ আমায় এভাবে অকালে যেতে হতো না! আমার রোগ ব্যাধি সমস্ত প্রভু যীশু স্বয়ং বহন করতেন।'

'হয়তো করতেন।' সান্ত্বনা ছলেই তার কথায় আমি সায় দিই : 'আমাদের প্রভু রামকৃষ্ণদেবও কারো কারো এমনটা করেছেন বলে শোনা যায়।'

'আমি বলছিলাম আমার দেনা পাওনার কথা।' বলল সে, 'সে সব কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে যেতে চাই আমি। তোমাদের বাইরে আর কারো সাথে তো মিশিনি কখনো, তোমাদের সঙ্গেই আমার যতো হিসেব নিকেশ।'

নিকেশের সময় আর হিসেবের কী থাকে! এই কথাটাই যত দূর সম্ভব মোলায়েম করে ভদ্র ভাষায় কী করে বলা যায় তারই ভাঁওতা হয়তো আমার মনে ভাঁজছিলাম এমন সময় বন্দ্যো তার আওয়াজ ছাড়ল : 'কী যা তা বক্‌ছো সব!'

'তুমি কারো কাছে কিছু ধারো না, যদ্দূর আমার ধারণা।' ঘোষণা করল ঘোষ।

ওর কথায় ডিটো দেবার ইচ্ছা ছিল আমারও, কিন্তু কেন জানি না কোনো উচ্চবাচ্য না করাই আমার সমীচীন বোধ হল। অধিক বলা বাহুল্যমাত্র ভেবে কিম্বা পুনরুক্তি করাটা ব্যাকরণবিরুদ্ধ দোষ

বিবেচনাতেই হবে হয়তো।

ঠিক মিত্রসুলভ না হলেও সে নিজেই কথাটা তুলল, 'কী হে, চকরবরতি, তুমি কিছু বলছ না যে!'

'আমি কী বলব,' আমি বলি।—'পাওনা গণ্ডার কথা যদি বলো তাহলে তুমিই বরং আমার—আমাদের কাছে পাও—যথার্থ বললে এই কথাই বলতে হয়।'

বন্দ্যো বলল, 'হ্যাঁ, সেই কথাই।'

'কথাটা যখন উঠলই তখন বলি।' বলল মিত্র: 'সময় অসময় সবারই হঠাৎ দরকার পড়ে, আশ্চর্য কিছু নয়। তোমরা সবাই আমার কাছে কখনো-সখনো দু পাঁচ টাকা নিয়ে থাকবে, ফিরিয়েও দিয়ে থাকবে, কিন্তু ওই চকরবরতি ফাঁক পেলেই আমার কাছ থেকে কিছু হাতিয়ে নিয়েছে কিন্তু ভুলেও কখনো আর উপুড়হাত হয়নি।'

ওর অভিযোগে আমার মৌন সম্মতি দেখা যায়। চুপ করে থাকি। 'এতদিন ধরে দু দশ টাকা করে নিলেও এতদিনে হয়তো সে শ দুয়েক টাকা নিয়ে থাকবে মনে হয়, যাক গে, ওই দুশ' টাকাই আমি ধরলাম।' সে বললে।

'তাই ধরে থাক।' জবাব দিলাম আমি, যদিও মনে মনে।

'যাই হোক, তেমন বেশি তোমরা নাওনি। এমন দুশো পাঁচশো কিছু না। তাহলেও, ঝড়তি পড়তি বাদ দিয়ে মেরে কেটে মোটমাট ঐ দুশো টাকা করেই আমি ধরলাম, তোমরা প্রত্যেকে ঐ দুশো টাকা করে আমার কফিনের ওপর ধরে দিয়ো। কেমন?'

বন্দ্যো ঘোষ নন্দী তক্ষুনি রাজি। কেবল আমি চুপ করে থাকি।

'টাকাটা বুঝি দিতে পারবে না তুমি? কী ভাবছ?' সে বলে।

'ভেবে দেখছি।' আমি বলি: 'ভেবে দেখি।'

'ও দেবে টাকা?' ঘোষ বলে উঠল হঠাৎ: 'তাহলেই হয়েছে! ও তো একটা বই লিখেই এসব প্রশ্নের জবাব দিয়ে রেখেছে কবে! চকরবরতী কঞ্জুষ নয়, ওর সেই বইটা পড়োনি? আমাদের সবাইকেই তো দিয়েছিল একখানা করে।'

'দিয়েছিল আমাকেও।' প্রকাশ করল মিত্র! '—কিন্তু সেটা যে এইভাবে আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই তা আমি ভাবিনি।'

'কঞ্জুষ! ও কঞ্জুষ! ওর জুসটা কোথায় যে কম আমি তো দেখতে পাইনে! এই বাজারে ও সিল্কের শার্ট ওড়ায়! শান্তিপুরী পরে। এসব চলে কী করে?'

'আমাদের পয়সায়। আমাদের ঘাড় ভেঙে ধার করে যা আমাদের উদ্ধার করে না—তার থেকেই', কথাটা বলতে বলতে নন্দীকে যেন আনন্দিতই দেখি।

'আমার বন্ধুরা ভাগ্যবান তা মানি, কিন্তু এ সব বন্ধুভাগ্যে হয়নি ভাই!' বাধ্য হয়ে বলতে হয় আমায়—'ভাইফোঁটায় পাওয়া সব। আমার বোনেদের বরাতে। তবে সত্যি বললে, আমার বোনরাই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু বলতে হয়।'

'ওই হোলো!' বলল ঘোষ: 'বোনের থেকে যেমন বোনাই মেলে তেমনি ঐ বোনাসও জুটে যায় আবার! বোনাই-এর বহুবচনই ত বোনাস্ তাই না? যেমন কিনা জিনিআই থেকে জিনিয়াস।'

'হয়েছে হয়েছে। তোমাকে আর ব্যাকরণের বিদ্যে জাহির করতে হবে না।' আমি বলি—'প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে—নহি নহি রক্সতি ডু ক্রিং করণে।' মোহমুদ্গর আওড়াই।

'হ্যাঁ, সেই মরণের কথাটাই আসল।' বলল মিত্র: 'ডাক্তার আমার বাঁচবার মেয়াদ দিয়েছেন মাত্র বারোদিন, এর ভেতরেই

আমার কাজকর্ম সব সেরে ফেলতে বলেছেন। সেইজন্যেই তোমাদের এই বলা আমার। এই কদিনের মধ্যেই আমার সব মিটিয়ে ফেলতে চাই। যাতে নিশ্চিত হয়ে মনের শান্তি নিয়ে নিজের কবরে যেতে পারি।'

'কিছু ভেব না তুমি। আমরা প্রত্যেকে দুশো টাকা করে তোমার কফিনের ওপরে রাখব! কথা দিচ্ছি তোমাকে।'

যুগলবন্ধুর এই যুগপৎ উচ্চারণে আমি সমস্বরে যোগ দিতে পারলাম না।

'তুমি চকরবরতি? কিছু বলছ না তো?' মিত্র কটাক্ষ করল আমার দিকে।

'ভাবছি ভাই। ভেবে দেখছি কী করা যায়।'

'এত ভাবাভাবির কী আছে। ব্যাংকে যে কাঁড়ি কাঁড়ি জমিয়েছ তার থেকে এই সামান্য কটা টাকা তুলে আনলেই হয়।' বলল ওরা।

ওদের প্রেরণায় ভাবান্বিত হতে হয় বাস্তবিক। 'তাই করতে হবে দেখছি'—ভাবাতুর হয়ে বলি অগত্যা।

'হ্যাঁ, তাই করো ভাই। আর মাত্র বারোদিন আমার হাতে মজুদ। একটু চটপট করো। বুঝলে?' বলল সে।

'বললাম তো, কিন্তু ব্যাংক বলতে আমার তো সেই রিভার ব্যাংক। বেসরকারি গ্যানজেস্ কোম্পানির। আমার সারাজীবনের তাবৎ উপার্জনের জলাঞ্জলি জমেছে গিয়ে সেখানে।'

তবে সেই সাথে সে কথাটাও মনে পড়ল বটে। নামজাদা এক ফিলম্‌স্টার, আমার বোন, একদা বিরক্তিভরে আমার নামে কোনো ব্যাংকে হাজার টাকার এক সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন একবার।

হয়েছিল কি, আমার কোনো ব্যাংকে কোথাও কিছু অ্যাকাউন্ট নেই জেনেও, জানানো সত্ত্বেও, আমার রসিক কোনো কোনো তৎপর প্রকাশক ক্রস চেক দিয়ে ছলনা করতেন আমাকে এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর তো কথাই নেই! রচনা পাঠের দক্ষিণা নামমাত্র হলেও সেই অঙ্গুলিমেয় টাকাটাও তাঁরা ক্রস্ চেক ছাড়া ছাড়তেন না।

এই সব ক্রস বয়ে কোথায় যাই? কার কাছে গিয়ে ভাঙাই? ব্যাংক অ্যাকাউন্টবান কেউই বিশেষ পাত্তা দিতে চান না। বলেন, ইনকমট্যাক্স-এ ধরবে। এতই তাঁদের ঐ ট্যাক্সের রোঝা যে তার ওপর বেনামী আমদানির এই সামান্য তৃণখণ্ডেই নাকি পৃষ্ঠভঙ্গ হবার দশা দাঁড়াবে। বাধ্য হয়ে আমার ঐ ফিলম্স্টার বোনের কাছেই যেতে হতো।

সে বলত, 'শিব্রাম্ দা, সেভিংস্ ব্যাংকে পাঁচ টাকার একটা অ্যাকাউন্ট করে রাখলেও পারো তো, তাহলে আর তোমাকে এই কষ্ট পোহাতে হয় না।' কিন্তু কোথায় পাই সেই পাঁচ টাকা? টাকা হাতে আসতে না আসতেই পথেই পাচার—এক টাকাও আর দেখা যায় না তারপর। সে বলেছিল, 'তোমার ঐ পথের পাঁচালি শুনতে চাইনে, চলো, আজ তোমার একটা অ্যাকাউন্ট করে দিই গে এখুনি।'

এই বলে তার ব্যাংকের দেশপ্রিয় শাখায় হাজার টাকার একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিল আমার নামে। কিন্তু অ্যাদ্দিন ধরে তুলে তুলে তার কিছু কি আর বাকী রয়েছে এখনো?

খোঁজ নিতে হয়।

দেশপ্রিয় শাখার পেল্লাই সব লেজার বইয়ের পত্রপল্লবের বহর ভেদ করে পাত্তা পাওয়া গেল আমার মৌচাকের। কিন্তু মধু আর

বিশেষ নেই তখন। না, খতম হয়নি একেবারে, বেঁচে বর্তেই তখনো, তবে প্রায় পঞ্চত্ব পাওয়াই বলা যায়।

শেষমেস পাঁচ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে অন্তিম দশায়। দাঁড়াক গে, আমার চেকবইটা পাওয়া গেল অটুট। যথালাভ। বারোদিনের দিন, বাড়াবাড়ির দিনে মিত্রের শয্যাপার্শ্বে বন্ধুরা সবাই আমরা উপস্থিত।

কথাটা পাড়লাম আমিই—'আমাদের টাকাগুলোর সঙ্গে তোমার পুঁজিপাটা যা আছে তাও তুমি রাখতে বলেছিলে কফিনের ওপর।'

'হ্যাঁ, সব নিয়ে যাব আমার সঙ্গে। নইলে মরেও আমার শান্তি হবে না।' বলল সে।

'তোমার টাকাকড়ি কোথায় সব?'

'কোথায় আর! আমার পকেটে, আমার এই ঘরের আনাচে কানাচে। খুঁজলেই পাবে।'

বলতে বলতেই সে চোখ বুজল। বেশী কিছু বলতে পারল না আর।

'এ ঘরের আনাচে কানাচে, তার মানে।' ওরা শুধালো আমার কাছে।

'মানে, এ ঘরের তক্তপোষ থেকে পাপোষ পর্যন্ত সবকিছুর ভেতর —সর্বত্র লুক্কায়িত, খোঁজো এখন।'

তক্তপোষের সমস্ত কিছু উল্‌টে পালটে, তোষক ফেড়ে বালিশ ফুঁড়ে আর ওর পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল মোটমাট তিনশো তিরানব্বই টাকা তের পয়সা। সেই সঙ্গে আমাদের ঐ যৎকিঞ্চিৎ অবদান যোগ দিতে আমরা তৈরি হলাম।

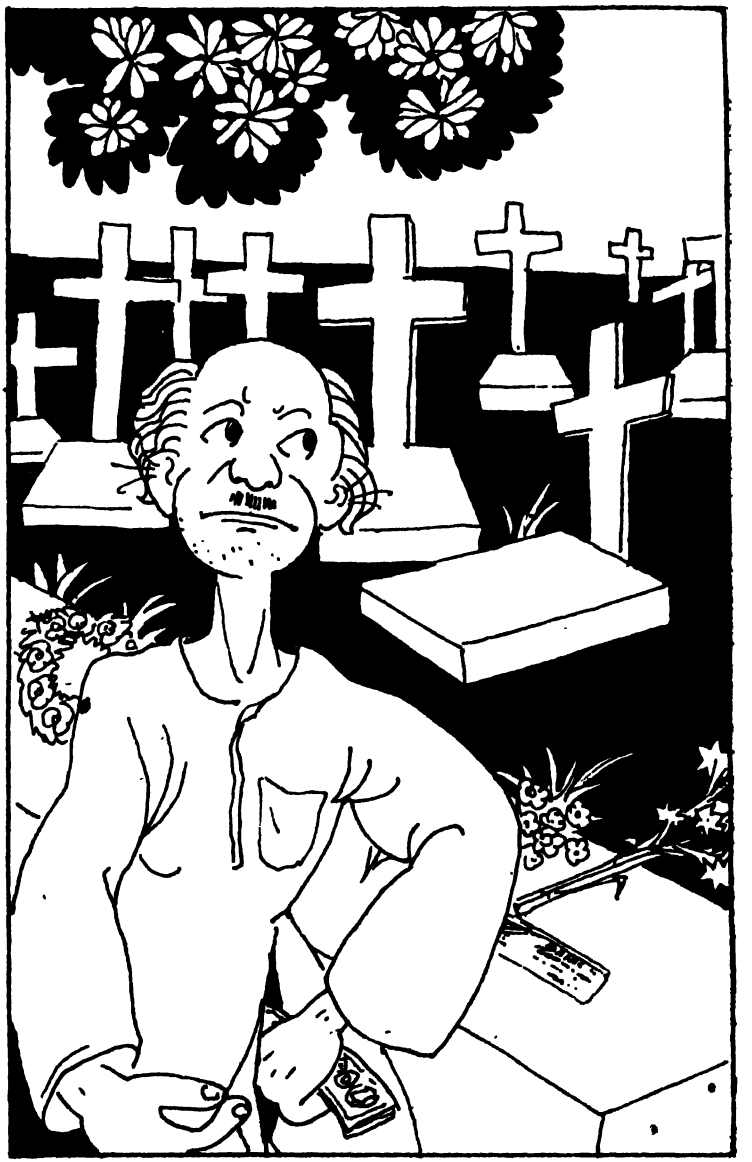

কফিন ইত্যাদির ব্যবস্থা করেই গেছল সে।

কবরস্থান থেকে কফিন গাড়ি এসে তুলে নিয়ে গেল ওকে।

অবশেষে যথাস্থানে গেলাম আমরা যথাকালে।

ওর সঞ্চিত তিনশো তিরানব্বই টাকা তের পয়সা রাখা হল কফিনের ওপর, সেই সঙ্গে ঘোষ রাখলো তার দুশো, নন্দীও তাই।

আমার চেকবইটা বার করলাম আমি···আমার দুশো যোগ করে মিত্রবরের নামে নশো তিরানব্বই টাকা তের পয়সার একটা চেক কেটে কফিনের ওপর রেখে তার ওপর থেকে সাতশো তিরানব্বই টাকা তের পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের পকেটে পুরলাম।

চশমার ডাঁট

ফুলের ডাঁট থাকে সেই ডাঁটের মাথায় সে শোভা পায়। Fool-রাও ভারী ডাঁট দেখায় আবার—সেটা নাকি তেমন শোভন নয়কো। এ ছাড়াও, চশমারও ডাঁট দেখতে পাই আমরা···

যে গাঁজা খায় তাকে যদি গাঁজাখোর বলে তাহলে সে নাকি চশমা খেয়ে থাকে···

সেই চশমখোর বলা উচিত আমাকেই। হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে চশমাই আমার খোরাক।

আমার মনের খোরাক। কতদিন ধরে যে মনে মনে চশমাকে আমি তারিয়ে তারিয়ে চিবিয়েছি। চেখে দেখেছি···দেখে চেখেছি।

সেই আমার দশবছর বয়স থেকে—বৃন্দাবনবাবুকে দেখা অব্দি। প্রথম দর্শনেই তাঁর চশমা জোড়াকে আমি ভালবেসে ফেললাম।

বৃন্দাবনবাবু আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন। আমাদের ছাদে ছোট্ট রবারের বল নিয়ে খেলতাম আমরা। বলটি একেকবার ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে ওঁদের বাড়ির আওতায় গিয়ে পড়তো।

ছোট্ট উঠোনটিতে ডেক-চেয়ারে বসে তিনি বই দেখতেন। মোটা মোটা বই। কী সব বই কে জানে।

'বলটা নেবো?' কাছে গিয়ে কথা পাড়তাম আমি।

কানে তিনি একটু খাটো ছিলেন। চোখ তুলে তাকাতেন তিনি—কী সুন্দর লাগতো যে। তাঁর চোখের দৃষ্টি সুন্দর ছিল কিনা জানি না,

কিন্তু অমন সুন্দর চশমার ভেতর দিয়ে তাকালে সে-চাউনি বুঝি কোনদিনই আর ভালো না হয়ে যায় না।

কী চমৎকার যে চশমাটা! ভেতরের কাঁচগুলো এমন কিছু নয়, আমি শুধু তার ফ্রেমের কথাই বলছি। সেই মোটা পুরু কালো রঙের ডাঁট! ফ্রেমখানা কাঁচ দুটোকে ঘিরে নাকের পেছনে গিয়ে শেষ হয়েছে। সে যে কী সুন্দর তা বলা যায় না।

আমি একবার চোখে পরে দেখেছিলাম। সত্যি, কাঁচগুলো কিছুই নয়। একেবারে যা-তা। তার ভেতর দিয়ে সবই কেমন ঝাপসা দেখায়। কিছু ভালো করে পড়া যায় না। বেশিক্ষণ পরলে মাথা ঘোরে।

ঐ চশমা পরে কত কষ্ট করে যে তাঁকে পড়তে হয়। কিন্তু কেন যে তিনি অত কষ্ট করেন তা টের পেতে আমার দেরি হয় না। ঐ ফ্রেমখানার জন্যই। ফ্রেমখানা দেখলে মাথা ঘুরে যায় সত্যি!

সেই তখন থেকেই আমার মনের সাধ অমনি একখানা আমাকেও পরতে হবে। ওটা পরে বৃন্দাবনবাবুকে এমন ভারিক্কী দেখায়! একটা মানুষের মতন মানুষ বলেই মনে হয়।

আর কথা বলবার সময় যখন তিনি চশমাটা খুলে নিয়ে মুড়ে দু-ভাঁজ করেন—করে নিজের হাতে রাখেন! আমার চোখ চকচক করে ওঠে। নাক আর কান নিসপিস করতে থাকে। আহা, কবে যে অমন একখানা আমার চোখমুখের শ্রীবৃদ্ধি করবে। নাকের ডগায় লাগিয়ে অমনি চৌকস দেখাবে আমায়। হায়, সেই বরাত কি আমার কোনদিন হবে! চার চোখো হয়ে ডাগর হয়ে উঠব!

কারু সঙ্গে কোন কথায় রেগে গেলে বৃন্দাবনবাবু চশমার একটা ডাঁট ধরে হাত নেড়ে গলা ছেড়ে বকতেন যখন—আমি হাঁ করে

দেখতুম। তাঁকে না, তাঁর চশমাকেই, চশমার ঐ ডাঁটখানাকেই!

আহা, আমি যদি কোনদিন ঐরকম ডাঁট দেখাতে পারি! ডাঁটাতে পারি কাউকে!

কিন্তু ডাঁট দেখাতে গিয়ে একদিন এমন হাসির হাট বসে গেল যে···

ফিরিওয়ালার কাছ থেকে একজোড়া সানগ্লাস কিনেছিলাম ঐ রকম ডাঁটওয়ালা। চশমাটির একখানা কাঁচ ছিল না, সেইজন্য খুব সস্তাতেই হয়েছিল। তা, কাঁচ না থাক, ডাঁট ছিলো বটে চশমাটির। বৃন্দাবনবাবুর মতই ঐ রকম মোটা কালো ডাঁট।

চশমাটির অন্য কাঁচটাও ভেঙে ফেললাম তখন। একচোখোর মত এক চোখে চশমাও ভালো দেখায় না। তারপর নাকের ওপর সেই ফ্রেম চড়িয়ে বেশ ডাঁটিয়ে ঘুরতে লাগলাম।

কিন্তু আমার সেই ডাঁট দেখানোয় সবার যে কী হাসি। হিংসেয় যে, তা আমি বেশ বুঝতে পারি। আর কারো অমন ফাসক্লাস চশমা নেই কিনা!

একটা ছেলে তো গায়ে পড়ে ইয়ার্কি মারতে এলো—'আরে এটা আবার কী পরছিস রে, দেখি দেখি।'

চশমাটা না দেখিয়ে—তাকে চশমা দেখাতে আমার বয়ে গেছে। —উলটে তাকেই বরং আমায় দেখতে হোলো···

আমি তাকে দেখলাম। চশমাটি নাকের থেকে খুলে, হাতে নিয়ে, পরিপাটি দুভাঁজ করে তারপরে তাকে দেখলাম। বৃন্দাবনবাবু ঠিক যেমন করে দেখে থাকেন।

অবিশ্যি, বৃন্দাবনবাবুর চশমার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট করে কিছুই দেখা যায় না। দেখলেও চেনা যায় না যে কাকে দেখছি। সেই

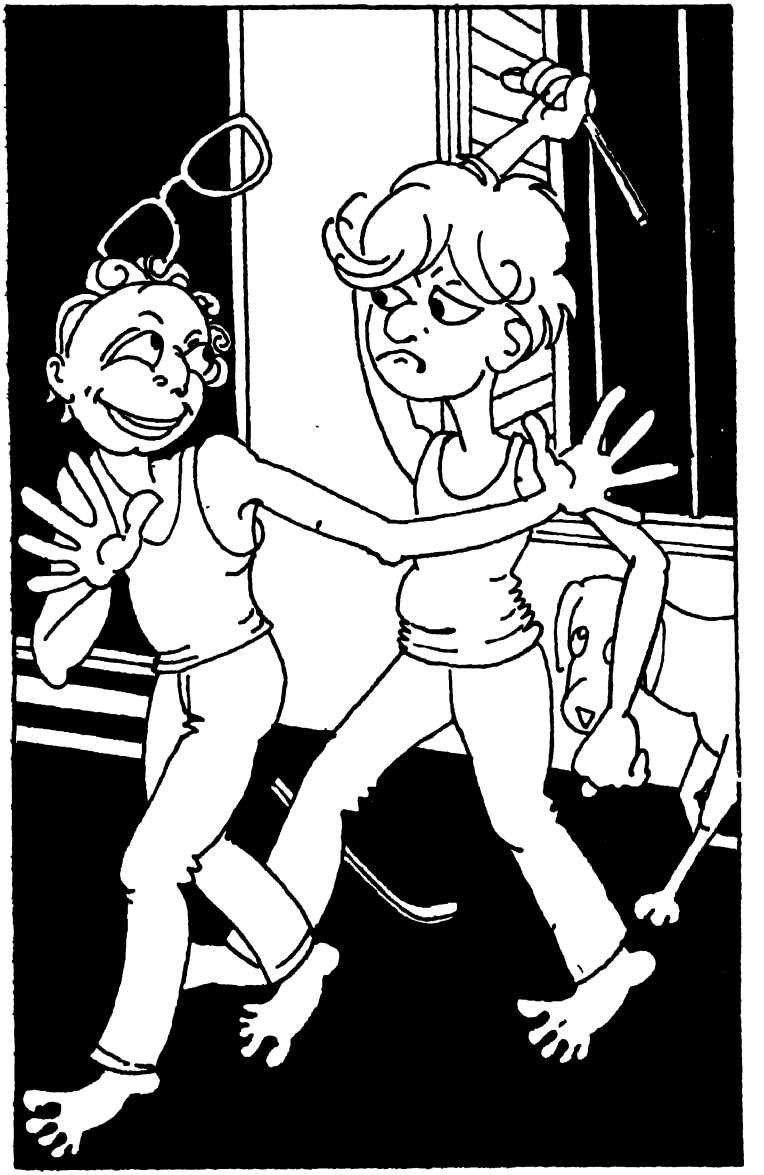

জন্যেই তাঁকে চশমা খুলে দেখতে হতো।

আমার বেলা কিন্তু তা নয়। আমার চশমার ফাঁকের ভেতর দিয়ে সবই দিব্যি দেখা যায়। ছেলেটির বাঁদুরে মুখখানা স্পষ্টই দেখছিলাম, তবু তার বদন-চন্দ্রটিকে আরো ভালো করে নিরীক্ষণ করার জন্যেই চশমাটা খুলে দুভাঁজ করে নিজের হাতে রাখতে হলো।

'তোর চশমার কাঁচ দুটো কী হলো রে?' বলল সে: 'চিবিয়ে খেয়েছিস নাকি?'

রাগবার কথা নয় কিছু। কিন্তু না হলেও আমায় রাগতে হলো। রেগে গিয়ে চশমার একটা পাল্লা ধরে, খুব জোরসে নেড়ে তার সঙ্গে বচসা সুরু করলাম—'সাত জন্মে এমন চশমা দেখেছিস কখনো?'

'আমার সাত পুরুষে না।' সে জবাব দিলে—'না ভাই, তোর মতন এমন চশমখোর আমি বাপের কালেও দেখিনি।'

বাপ তোলা ভারী খারাপ। ভীষণ গাল। আমার জানা ছিল। এমন কি, কেউ যদি নিজের বাপ তোলে তাহলেও। এবার সত্যি সত্যি আমার রাগ হলো। তার বাবার মর্যাদা রাখতেই, চশমার ডাঁট দিয়ে এমন পিটোন তাকে লাগালাম যে তার পাল্লায়—চশমার দুটো পাল্লাই আমার গেল। গোল্লায় গেল সটাং।

চশমাটা তিন টুকরো হয়ে দুদিকে ছিটকে গেল। শুধু একটা টুকরো আমার হাতে রইলো কেবল।

সে টুকরোটিকেও আমি একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে মনের দুঃখে ফিরে এলাম। যাক গে, গেলোই না-হয় এ-চশমা। নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম—যাক। একদিন তো আমি বড়ো হবোই। আর বড়োলোকও

হবো। হবে অঢেল পয়সা। তখন বৃন্দাবনবাবুর মতোই একজোড়া ডাঁটওয়ালা—তবে ওনার চেয়ে আরো পরিষ্কার কাঁচ—যার ভেতর দিয়ে দিব্যি সব দেখা যায়, কিনতে পারবো। কিন্তু কাঁচ যাই হোক, ফ্রেমখানা চাই আমার ঠিক তাঁর মতই। এই সাধ আমার মনের মধ্যে পুষে রাখা—সেই ছোটবেলার থেকে। বৃন্দাবনবাবুকে দেখার থেকেই। অবশ্যি, তার পরে আমরা সে পাড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। তাঁকেও অনেকদিন দেখিনি আর।

তারপর বছর ত্রিশেক কেটে গেছে। সেদিন নিজের বইয়ের প্রুফ দেখতে গিয়ে হঠাৎ সব ঝাপসা দেখলাম। হরফগুলো যেন মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। মাথা ধরতে থাকলো।

ডাক্তারের কাছে যেতে হলো তখন। তিনি চোখ পরীক্ষা করে বললেন—'না, কোনোই সন্দেহ নেই। চোখ আপনার খারাপ হয়েছে।'

'চোখ খারাপ?'

'হ্যাঁ, তবে এমন খুব খারাপ নয়। এখনো ততটা হয়নি। প্লাস পাওয়ারই। কিন্তু তাহলেও এরপর থেকে লেখাপড়ার কাজে আপনাকে চশমা ব্যবহার করতে হবে।'

'অ্যাঁ, কী বললেন?' শুনেই আমার ফুর্তি যেন উথলে উঠলো—'তা, তা যদি হয় তো···চশমা ব্যাভার না করে যদি না চলে, তাহলে করতেই হবে। কী করা? বাধ্য হয়েই।'

মনের আনন্দ চেপে মুখ ভার করে বলি।

এতদিনে ছেলেবেলার সাধ—চশমার সাধনা বুঝি সফল হতে চলেছে। সাধের চশমা আমার নাকে আসবে এইবার।

ডাক্তারবাবু একটুকরো কাগজে কী যেন লিখে আমায় শুধোলেন —'কি রকমের ফ্রেম চাই আপনার ?'

আমার বুকটা যেন চলকে উঠলো—'বৃন্দাবনবাবুর মতই।' আমি বল্লাম।

'কোন বৃন্দাবনবাবু ?'

তখন আমি—বৃন্দাবনবাবু, মানে, তাঁর চশমার ফ্রেমের পরিচয়টা তাঁকে জানালাম।

'এই রকম বলছেন ?' বলে তিনি হাসতে হাসতে একজোড়া ঐরকম ফ্রেম টেনে আনলেন। হ্যাঁ, সেই ফ্রেমই বটে। যা শয়নে স্বপনে জাগরণে আমার মনের সঙ্গে গাঁথা। মনশ্চক্ষে লাগানো সেই কালো পুরু মোটা—ডাঁটওয়ালা ফ্রেমখানা চোখে লাগিয়ে আয়নার মধ্যে তাকালাম। আহা, কি চমৎকারই না দেখাচ্ছে আমায়! 'হ্যাঁ মশাই, এই জিনিসটাই আমি চাইছিলাম। এই আমার ফ্রেম।'

'এই ফ্রেম আপনি চশমায় ব্যাভার করবেন ?' ডাক্তারবাবুকে যেন একটু অবাক হতে দেখা গেল।

'চশমা ব্যাভার করতে হলে চশমার সঙ্গে ভালো ব্যাভারই করা উচিত।...মানে আমি বলছি কি, ভালো চশমাই ব্যাভার করা উচিত। তাই না কি ?' আমি বল্লাম।

'কিন্তু এ ধরনের ফ্রেম তো এখন চলে না।' তিনি বললেন— 'ফ্যাসান বদলে গেছে একালে, আজকাল হালফ্যাসানের ফ্রেম চালু। তাছাড়া এ যে বেজায় ভারী হবে। আরো কথা কি, খুব গোলালো মুখ না হলে এমনতর মোটা ফ্রেম তেমন মানায়ও না।'

'সে আমি মানিয়ে নেব। সেজন্যে আপনি ভাববেন না। এরকম

ফ্রেমের জন্যে দাম যদি কিছু বেশি দিতে হয় তো বলুন তাতেও আমি রাজি।'

'না না। এ তো বরং দামে ঢের সস্তাই পড়বে। বেশ, আপনি যখন বলছেন—! কাল এই সময়ে আসবেন, নিয়ে যাবেন আপনার চশমা।'

সেই ভারী চশমা লাগিয়ে ভারিক্কি চালে পরদিন আপিসে গেলাম বেশ ডাঁটসে। গট্‌গট্‌ করে ঢুকতে দরজাতেই আপিসের বেয়ারা বাধা দিল—'কাকে চাই?'

'তার মানে?' আমার বেয়ারা হয়ে আমাকেই কেয়ার না করা? যেন চিনতেই পারছে না। বেয়ারার এই বেয়াড়া ব্যবহারে আমার অবাক হবার কথাই! কিন্তু অতিকষ্টে বিস্ময় দমন করে আমার রাগতে হোলো। চশমাটা নাকের থেকে হাতে নিয়ে দুভাঁজ করে আমি বল্লাম—'কাকে চাই তা কি এখনো টের পাওনি বাপু?' রেগে মেগে চশমার পাল্লাটা নেড়ে নেড়ে তেড়ে মেড়ে উঠলাম।

টের সে আগেই পেয়েছিল—আমার গলার আওয়াজ বের হতেই। কিন্তু আমার ডাঁট, তার ওপরে চশমার ডাঁট—এই ডবোল ডাঁট দেখেই সে হতভম্ব হয়ে গেছে।

হতেই হবে। আরে বাপু, তা হওয়ার জন্যে, হওয়ানোর জন্যেই তো এই চশমা!

সারাদিন ধরে আপিসের এঘরে ওঘরে জাঁক করে বেড়ালাম—সবাইকার তাক লাগিয়ে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় আমার নিজেরই তাক লাগলো। বলতে কি—এমনটা হবে, আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি।

বাড়িমুখো বাসের অপেক্ষায় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি—

এমন সময়ে কাকে দেখলাম ? বৃন্দাবনবাবুকেই না ?

তিনিও বুঝি বাসের অপেক্ষাতেই ছিলেন ! কিন্তু তাঁর সেই চশমা গেল কোথায় ? সেই চশমার চমক্‌দার বস্তুটির জায়গায় তাঁর নাকে ওটা কী ? ছুঁয়ে আছে—কি নেই—এমনি ধারা নামমাত্র না-ফ্রেমের-ধরা-ছোঁয়ার দুটি লেন্স-এর জোড়াতালি মারা—এ আবার কী চীজ ? চশমাই বটে, কিন্তু তাঁর ডাঁট-ফাঁটের কোনো বালাই নেই ! কিন্তু তাহলেও, বলতে হবে···

হ্যাঁ, তাতেই এমন চমৎকার দেখাচ্ছিল তাঁকে ! তাতেও।

'আপনার সে চশমা গেল কোথায় ?' আমার প্রথম কথা হোলো ঐ।

চশমা না খুলেই তিনি দিব্যি আমায় চিনলেন—তার ভেতর দিয়েই। এতদিন পরেও।—'ওঃ, তুমি সেই ছোট্ট ছেলেটি ? না ? না, ছোটোটি আর নও, তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ কি চশমা তোমার ? কী অদ্ভুত ফ্রেম পরেছো গো ? এ তো আজকাল কেউ পরে না। এমন ধারা কি কেউ পরে নাকি এখন ? তাছাড়া, এ ধরনের মোটা ফ্রেমে তোমায় মানায়ও না তেমন।'

কথাটা আমার বিশ্বাস হলো—তাঁকে দেখেই। সেই ডাঁট-বিহীন চশমায় এইসা তাঁকে মানাচ্ছিল। অমন একখানায় যে আমাকে খাসা মানাবে, শুধু উপদেশ নয়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়েও যেন তিনি বুঝিয়ে দিলেন।

না, কালই আমায় ফের যেতে হবে সেই ডাক্তারের কাছে অমনি ধারা রীম্‌লেস চশমা না হলে আমার চলবে না। ঠিক ঐ রকমটিই চাই আমার।

বৃন্দাবনবাবুর মতন চশমা না হলে চলে কি ?

ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ

শিক্ষালাভের কোনো বয়েস নেই সে কথা সত্যি। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, পরমহংসদেবের সার কথা। আর যত শিখি ততই দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে, আর যত দেখি ততই শিখি—ততই আরো শিক্ষা হয়।

শিক্ষা পাওয়ার স্থান কাল পাত্রর ঠিক-ঠিকানা থাকে না—সে কথাও ঠিক। তবে তার প্রণালীর ইতরবিশেষ নিয়ে প্রশ্ন থাকেই।

সেদিন হর্ষবর্ধনের উদ্দেশে (অবশ্যই অর্থবর্ধনের দ্বারা) চেতলায় গিয়ে দেখলাম বাড়ির রোয়াকে গোবর্ধন গালে হাত দিয়ে বসে মুখ ভার করে।

'দাদা বাড়ি নেই নাকি ?'

গোবরার কোনো জবাব নেই।

'বেরিয়েছেন কোথাও ? কোথায় গেছেন ?'

'হাসপাতালে।'

শুনেই চমকে যাই—'হাসপাতালে কেন হে ? কার জন্যে যাওয়া ?'

'নিজের জন্যেই। আবার কার ? পড়ে গিয়ে পায়ের হাড় ভাঙলেন তাঁর। সেইজন্যেই।'

'সেইজন্যেই মনমরা হয়ে রয়েছো ! ভেবে মরছো এমন ! হয়েছে কী ! হাত পা ভাঙা তেমন শক্ত কিছু, সাংঘাতিক কিছু নয়। পড়ে

গিয়ে গায়ের হাড় ভাঙলেও পায়ের হাড় ভেঙে কেউ মারা পড়ে না। হাড় জোড়া লাগে আবার। অল্পদিনেই—সহজেই। আজকাল আকচার ভাঙছে জুড়ছে, বুঝলে? ভাবনার কিছু নেই। যেমন পড়েছেন তেমনি উঠে পড়বেন দেখতে না দেখতেই। কিছু ভেব না।'

গোবর্ধন তথাপি ভাবনায় হাবুডুবু খায়। আমিও যে খানিক ভাবিত না হই তা নয়।

জানি যে, পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, পতনের পরই অভ্যুত্থান, কিন্তু উক্ত বন্ধুকৃত্য পরখ করতে সেই আভ্যুদয়িকের পথে পা বাড়াবার মতিগতি হবে কার? পড়লে অপদস্থ হতে হয়, কিম্বা অপদস্থ হলেই মানুষ পড়ে তা সত্যি, তবু না পড়লে ওঠা যায় না, পদস্থ হওয়াও যায় না সে কথাও কিছু মিছে নয়; তবু নিজের পায় নতুন করে দাঁড়াবার জন্য পদোন্নতির স্বার্থে কে আবার পা ভেঙে ব্যানডেজ প্লাসটারে পায়াভারী হতে চাইবে?

'কী করে ভাঙলেন পা?' আমি জানতে চাই।

'এই যে, সামনেই এই তিনটে ধাপ দেখছেন না? রোয়াকের এই তিনটে পৈঠে? দেখছেন, দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি বইকি।'

'আপনি তো পাচ্ছেন, কিন্তু দাদা দেখতে পাননি। এই ধাপগুলো দিয়ে নামবার সময় ভাবতে ভাবতে নামছিলেন বোধ হয়, কেমন করে পা ফসকে...'

'ভাবের ঘোরে পড়ে গেছেন। বুঝেছি।'

ভাবুক লোকের পদে পদেই বিপদ ঘটে, কে না জানে?

'পড়ে গিয়ে আর খাড়া হতে পারেন না। আমি এখানেই ছিলাম, দৌড়ে গিয়ে তাঁকে তুলে ধরলাম। আর তারপরই

অ্যাম্বুলেন্স ডেকে—'

'তাঁর ওই পাতাল প্রবেশ ? কোন্ হাসপাতালে গেছেন শুনি ?'

'রামকৃষ্ণ মিশনের কী একটা নামকরা সেবাশ্রম আছে না ?'

'সেই যেখানে উনি প্রায়ই দান-খয়রাত করে থাকেন ? সেখানেই আবার প্রাণ খয়রাত করতে গেছেন ?'

'এমন কথা কইছেন কেন ? সাধারণ হাসপাতালে সেবা-যত্নের অভাবে চিকিৎসা বিহনে রুগী মারা পড়ে, তাই বলছেন ? কিন্তু রামকৃষ্ণর নামে করা নামকরা এসব জায়গায় সেসব হবার উপায় নেই। সেবাশ্রম বলছে না ? কী শুনলেন ?'

'শুনব না কেন ? দেখেছিও তো। সেবা দেবাশ্রম সবই দেখা। তবে কোথায় সেটা ? কখন যাওয়া যায় ?'

'যখন তখন। হাত পা ভাঙলে, এক্ষুনি।'

'না না, সে যাওয়া নয় ভাই, তোমার দাদাকে আমি দেখতে চাই। কখন ভিজিটিং আওয়ারস ? বেড নম্বর কত ?'

'কেন মিছে কষ্ট করে যাবেন ? এখানেই দেখতে পাবেন। উনি সেরে উঠেছেন দেখে এসেছি, আজকালের মধ্যেই ছেড়ে দেবে জেনে এলাম। দেখতে দেখতে এসে পড়বেন···'

বলতে বলতে এসে গেলেন। গোবর্ধন কথাটা শেষ করার আগেই ভ্যাঁক ভ্যাঁক করে একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়াল। হর্ষবর্ধন নামলেন তার থেকে—হাসতে হাসতেই।

'এই তো দাদা এসে গেছে!' উচ্ছ্বসিত গোবরা চীৎকার ছাড়ে—'বৌদি! দাদা এসেছে—দাদা এসেছে!'

হন্তদন্ত ওর বৌদি ছুটে আসেন হাতা খুনতি হাতে।

'আমি জানতাম তুমি আজ আসবে। তোমার জন্যেই সেই

জিনিসটা রাঁধছিলাম এখন, যেটা তুমি খেতে খুব ভালোবাসো।'

'এতক্ষণ ওঁর সঙ্গে তোমার কথাই হচ্ছিল দাদা! বলতে বলতে তুমি এসে পড়েছ! দাদা, তুমি অনেকদিন বাঁচবে। অ-নে-ক দিন।'

গোবর্ধন গদগদ হয়ে বলে।

'দাঁড়াও, কড়াইটা নামিয়ে আসি, ধরে যাবে জিনিসটা···' বলেই বৌদি হাতা হাতে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ন—হাতে হাতে তাকে সামলাতে, কি, সাঁতলাতেই!

'বাঃ বাঃ! আপনি সেরে এসেছেন বেশ। দেখতে পাচ্ছি।' উৎসাহিত হয়ে বলি।

'হ্যাঁ, পা-তো সেরেছে কিন্তু মন আমার ভেঙে গেছে মশাই!' তিনি দুঃখ করে বলেন।

'কেন! তারা ভালোই সারিয়েছে আপনাকে। কপাল জোরই বলতে হয় আপনার। ভাঙা পা জুড়ে গেছে দিব্যি! একবার অধঃ-পতনের পর দেখেছি পরে আর কেউ ঠিকমত দাঁড়াতে পারে না। দুটো পা কেমন করে একটুখানি ছোটবড়ো হয়ে যায় যেন। লক্ষপতি লোককেও পদস্খলনের পর জীবনভোর একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা গেছে—কী দুঃখ বলুন তো! কিন্তু আপনার বেলায় উঁচু নীচু হয়নি কিছু। বেশ হাঁটছেন। দিব্যি জুড়ে গেছে পা।'

'পা তো জুড়েছে কিন্তু মন জুড়োয় কে!' তিনি নিশ্বাস ফ্যালেন, 'আমার এই ভাঙা মন কে জোড়া দেয়? আমি ভগ্ন মনে ফিরে এলাম সেবাশ্রম থেকে।'

'সে কী! পা সারিয়ে হৃদয় হারিয়ে ফিরলেন?' বিস্মিত হতে হয়: 'কোনো নার্স টার্স নাকি? কিন্তু মনোভঙ্গ হবার বয়স কি আছে আর আমাদের?'

তিনি মুহ্যমান হয়ে থাকেন, কোনো কথা নেই।

'ওসব নিয়ে মন খারাপ করবেন না। আপনার আমার বয়সে ভীমরতির মতন হয় জানি, ও কিছু নয়। ঠিক যুধিষ্ঠির-গতির আগেই ওটা হয়ে থাকে। তারপরেই তো মহাপ্রস্থান। ওর জন্যে কোনো বিশল্যকরণীর প্রয়োজন নেই, প্রিয়জনটিকে অপত্যস্নেহের চোখে দেখুন, অকথ্য পথে যাবেন, বাতসল্য বলে মনে করুন না!'

তবুও ওঁর কোনো বাতচিৎ নেই!

'কেন ওকথা ভাবছেন! আপনার পা সেরেছে, দিব্যি জুড়ে গেছে এমন! সেই আনন্দে নৃত্য করুন বরং! আপনার পা দেখে আমারই যে নাচতে ইচ্ছে করছে মশাই!'

'ধুত্তোর পা। পা আমার গোল্লায় যাক, চুলোয় যাক। মাথায় থাক পা! তার কথা আমি ভাবছিও না। আমি ভাবছি তাঁর শ্রীচরণের কথা। সেই ভাবনাই আমার—কী করে পাই! তাঁর পায়ে কি ঠাঁই হবে আমার?'

'কার পায়?' আমি জানতে চাই।

'ঠাকুরের। তাঁর পায়ে কি আমি স্থান পাব কোনোদিন?'

'পরমহংসদেবের? কী করে পাবেন? তিনি তো পা ফা সমস্ত নিয়ে অন্তর্ধান করেছেন কবে! তিনি কি সশরীরে স্বপদে বহাল আছেন এখনো?'

'আহা, ইহলোকে না হোক, পরলোকে? তা কি আমি পাব না?'

'কী করে বলব? পরলোকের খবর আমি রাখিনে। তবে তাঁর দুটি মাত্র পা ছিল এই জানি। সে দুটি তো বিবেকানন্দ আর শ্রীশ্রীমা দখল করে বসে আছেন, যেমন এখানে তেমনি সেখানেও।

তাঁর পার্ষদবর্গের আর কেউ পেয়েছেন মনে হয় না। তবে অচিন্ত্যনীয় উপায়ে কেউ যদি পায়ে ঠাঁই পেয়ে থাকে বলা যায় না।'

'আপনি কোনো ধর্মগুরুর সন্ধান দিতে পারেন আমায়? যাঁর কাছে একটু ধর্মশিক্ষা পাওয়া যায়?'

'আজ্ঞে না। ধর্মকে আমি গুরুত্ব দিইনি কোনোদিন, এ জীবনে কখনো ধার ধারিনি তার। কী করে তার খবর দেব আপনাকে? বলুন!'

'সে কী! মুক্তি চান না আপনি?'

'একদম্ না। মারা গেলেও নয়। পাছে কোনো কারণে আমায় স্বর্গে যেতে হয় সেই ভয় আমার দারুণ। সাবধান থাকি, প্রাণ থাকতে ধর্মকর্ম কিছু করিনে। স্বর্গে নয়, পৃথিবীর এই রসাতলেই ফিরে আসতে চাই ফের—একবার নয়, আবার আবার বারম্বার।'

আমার কথায় তিনি কান দেন না, নিজের আবেগে বলে যান—'জানেন, সেবাশ্রমে এক স্বামীজী আসতেন রোজ। সব রুগীর কাছেই আসতেন, ধর্মশিক্ষা দিতেন সবাইকে। তাঁর কাছে আমি অনেক জ্ঞান পেয়েছি, কিন্তু এই অল্প কদিনে যতটুকু হবার তাই হলো, ধর্মশিক্ষার পুরোটা হয়নি আমার। আধা-খ্যাচরা এই ধর্মশিক্ষা আমি সম্পূর্ণ করতে চাই। কোথায় করি।'

'খোদায় মালুম। খোদার ওপর খোদকারি-করার লোক কোথায় থাকেন, কোন ঘুপচির মধ্যে, কোনো আশ্রমের গর্ভে কি হিমালয়ের গহ্বরে আমার জানা নেই। স্বামীজীরা স্ত্রীজীরা কোথায় কোথায় আছেন যেন শুনেছি—পাপীতাপীদের উদ্ধার করার জন্যেই। আমার জানা নেই। জানবার উৎসাহও নেই। পাপী মানুষ কিন্তু তাপী নই, পাপের ওপর ধর্মের সন্তাপ বাড়িয়ে উত্তপ্ত হবার বাসনা নেই আমার।

বললাম তো আপনাকে।'

'শুনেছি শুনেছি, ঢের শুনেছি—বলতে হবে না আর। ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ করার কোনো পথ বাতলাতে পারেন যদি, জানেন যদি বলুন আমায়।'

'আমি জানি দাদা। বলব তোমাকে?' গোবরা উসকে ওঠে।

'তুই জানিস! তুই!' দাদার বিস্ময় থই পায় না।

'হ্যাঁ। তুমি ধর্মশিক্ষার বাকী আদ্ধেকটা পেতে চাও তো? তার উপায় হচ্ছে, তোমার অন্য পাটাও ভাঙা। তাহলেই হবে।'

'পাঁঠার মত বলিস কী! একটাকে এত কষ্ট করে সারিয়ে আনার পর আমার অন্য পাটাও ভাঙব আবার?' হর্ষবর্ধন হতবাক হন।

'তা না হলে কী করে হবে?'

'হ্যাঁ, তাহলে হয় বটে,' ভেবে ছাখেন দাদা—'হ্যাঁ, তাহলে হয়। তাহলে আবার আমি সেই সেবাশ্রমে যেতে পারি, সেই স্বামীজীর সাক্ষাৎ পাই, তাঁর কৃপায় বাকীটাও পেয়ে যাই। হ্যাঁ, তাহলে হয় বটে। তিনিও তাই বলেছিলেন যে ধর্মশিক্ষা পেতে হলে অভীপ্সা চাই।'

'কী বললেন? কীপসা?' আমি চমকে যাই।

'অভীপ্সা। কী মানে ওর, জানিনে ঠিক। তবে তিনি বললেন যে তাই হলেই নাকি উত্থান ব্যুত্থান সব হয়ে যায়।'

'কীত্থান বললেন?' আবার আমি চমকাই, 'কেন একেকখান থান ইঁট ঝাড়ছেন। শুনে মাথা ঘুরছে আমার।'

'ঘুরবার কথা। আমারও ঘুরেছিল। তিনি বলেছিলেন যে প্রাণের আকুতি যাকে বলে না, সেই জিনিস নাকি।'

'তাই তো বলছি দাদা তোমায়। হাড়গোড় ভাঙলেই সেই

আকুতি হয়—আপনার থেকেই-হয়ে যায়। হতে থাকে কেমন।'

তাই হয় বটে, আমিও খতিয়ে দেখি। কোনো ক্ষতি না হলে কি কিছু লাভ হতে পারে! অধঃপতিত পদদলিতরাই তাঁর কাছে যেতে পায়। Meekদেরই রয়েছে স্বর্গের উত্তরাধিকার, বাইবেলে বলা, অহঙ্কৃতের ঠাঁই নেই সেখানে, বরং উটরাও ছুঁচের ছ্যাঁদা দিয়ে গলবে, কিন্তু অহমিকা আছে যাদের সেই অহমিকরা (নাকি, আহম্মকরা ?) কদাচ না।

'কিন্তু পাঁঠার মতন তোর কথাটা না ? ধীরে সুস্থে কি করে ভাঙব আস্ত পা-টা ?'

'কিছু শক্ত নয় দাদা, খুব সহজ, রোয়াকের এই তিনটে ধাপ দেখছো তো ? সেদিন যা তুমি দেখতে পাওনি বলেই পা ফসকে এই ধর্মশিক্ষা লাভের সুযোগটা পেলে না ? ওই ধাপ দিয়ে উটমুখো হয়ে উটকোর মতই আবার তুমি উঠানামা করো, তাহলেই হয়ে যাবে। সব শিক্ষাই ধাপে ধাপে পেতে হয়, তাই না ? তোমার ওই ধর্মশিক্ষা মানে, ধর্মশিক্ষার বাকী আধখানা পেতে হলেও তাই করতে হবে তোমাকে। এগুতে হবে এই ধাপে ধাপে।'

'ধাপে ধাপে ?'

'ধর্মকে ধাপপা বলে না দাদা ? এইজন্যেই তো ?'

তিন ওয়ালা আর এক ওয়ালী

আমরা তিন ওয়ালা, কলকাতাওয়ালা বোম্বেওয়ালা আর দিল্লী-ওয়ালা—দেশের তিন কোনার থেকে তিনজনা এসে হাজির—নয়া ভারতের কোনারকে—তাজমহলে আগ্রায়।

নব্য ভারতের নয়া কোনারক আগ্রার তাজমহলে।

আগ্রার আসন থেকে, আরো আগ্রাসনের বাসনা ছিল আমাদের। কাঠমাণ্ডুতে পশুপতিনাথ দর্শনের মতলব।

সেই অগ্রগতির হেতু আরেক বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। পুরীর থেকে নিজের মথ্ প্লেনে তিনি আসবেন, তিনি এলেই যাত্রা শুরু। তাঁর প্লেনে বিমানপথেই আমাদের ব্যোম মহাদেব!

স্টেশন থেকে নেমেই মমতাজের মন্দিরে ছুটেছিলাম, তার মম্‌তা কাটিয়ে তাজমহলের থেকে আগ্রার এক হোটেলে গিয়ে আমরা জমলাম তারপর। বিমানবন্দরে গিয়ে বন্ধুর প্রতীক্ষা করা যেত কিন্তু তার চেয়ে হোটেলই যেন বেশি জমাটি।

ওয়ালীটি জুটলেন সেইখানেই।

মুখ্যব্যক্তি না হলেও বাঙালী যে কোনো নাগরিক নিজেকে কলকাতার মুখপাত্র বলে জ্ঞান করে। কারণে অকারণে সব সময়ে নিজের শহরের মুখরক্ষা তাকে করতেই হয়।

তাই বোম্বেওয়ালা যখন গাইলেন, 'আপনাদের কলকাতার আর কী আছে মশাই! দিনরাত তো খালি বোমরাজি। তাই নিয়েই

মশগুল আপনারা, আবার কী ?'

আর দিল্লীওয়ালাও নিজের মৌনতায় সায় দিলেন তাঁর কথায়, তখন বাধ্য হয়েই মুখর হতে হল আমাকে—

'আপনাদের বোম্বেতেই বা আছেটা কী! বোম্বেওয়ালাদের কোনো একটা হুজুগ হলেই হলো। নতুন কোনো ফ্যাশান কি নয়া ডিজাইনের কোনো পোশাক-আশাক কিম্বা নতুনতর একটা ফ্যাশানের স্টাইল—ব্যস্, মেতে উঠল বোম্বাই। বোম না থাক, বাই আছে বোম্বাইয়ের।'

'তোমাদের বোম আর বাই আর আমাদের নিউ ডিল্লীর নয়া নয়া ডীল! সবাইকার জন্যেই।' দিল্লীওয়ালা নিজের ঝুলির থেকে দিল্লীর লাড্ডু ছাড়লেন একখানা।—'এই লাড্ডু খাও চাই নাই খাও, পস্তাতে হবে সবাইকেই।'

'না খেয়ে পস্তানিটাই তো দেখছি এখন!' না বলে আমি পারি না —'এতক্ষণ ধরে না খেয়ে পেটও খাঁই খাঁই, ওদিকে লান্চের কোনো ঠিক ঠিকানাই নেই!'

অনেকক্ষণ ধরে উদরে ক্ষুধার লাঞ্ছনা টের পাচ্ছিলাম—লান্চ না হলে আর চলছিল না।

'এই কথা!' বলেই বোম্বেওয়ালা বোঁ করে তাঁর কলিং বেলটা টিপলেন—টিপতেই হোটেলের বেয়ারা এসে হাজির!—'হুজুর! ফরমাইয়ে।'

'যাও, আমাদের তিনজনার জন্য লাঞ্চ নিয়ে এসো, আর সেই সঙ্গে তিনটে বীয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি।'

বেয়ারা চলে গেলে পর আমি শুধোলাম—'তোমাদের সেই বন্ধুটি ভুবনেশ্বর থেকে না কোথ্থেকে আসবেন যে তাঁর মনোপ্লেন নিয়ে—

কখন নিজের প্লেনে তিনি নেপালে নিয়ে যাবেন আমাদের ?'

'যথাসময়ে। সেজন্যে ভেব না।' জানালো দিল্লীওয়ালা।—'একেবারে কাঁটায় কাঁটায় তাঁকে পাওয়া যাবে। মিলিটারি অফিসার—ভদ্রলোক ভারী পাংচুয়াল। নিজের প্লেন নিজেই চালিয়ে আসবেন।

'বটে বটে ?' কথাটায় উৎসাহিত হয়ে উঠলো বোম্বেওয়ালা: 'আমারও ইচ্ছে করে এমনিধারা একটা ছোটখাটো প্রাইভেট প্লেন রাখি। নিজে চালাই। যেখানে খুশি যাই—যখন খুশি। মোটার ফোটারের আর ইজ্জত নেই আজকাল। প্লেনটাই চালু ফ্যাশান এখন।'

'তোমাদের বোম্বাইয়ের মোটরের বাই মিটে গেল নাকি ?' আমি শুধাই।

'তেমনটা ঠিক এখনও না হলেও তা প্রায় যাওয়ার মতই। যায় যায় দশায় বলা যায়। পথে ঘাটে যা ট্রাফিক জাম্ আজকাল না! সব শহরেই একরকম। কাজকর্ম কিছুই সময়মত হয় না, হবার নয়। আকাশ ছাড়া গতি নেই আমাদের।'

দরজায় মৃদু করাঘাত করে ট্রে ভর্তি লান্চ নিয়ে বেয়ারা ঢুকল। আর, তার ল্যাজ ধরে তিনটি তরুণী সাথে সাথে।—'আপনাদের লাঞ্চ হুজুর! আর এই…' বলেই সে থামল। বস্তুতঃ তার পর তার আর বলার কিছু ছিল না। কেননা উহ্য কথাটি আমাদের সামনে পরিদৃশ্যমান হয়েছিল। ট্রের পিছু পিছু ট্রেলারের ন্যায় পরীর মত দর্শনীয় তিনটি তরুণী।

তাজমহলের মতই দৃশ্যস্থানীয়

'এঁরা কারা ?' শুধালো দিল্লীওয়ালা।

'এঁরা…ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐ যে—যা চাইলেন আপনারা।'

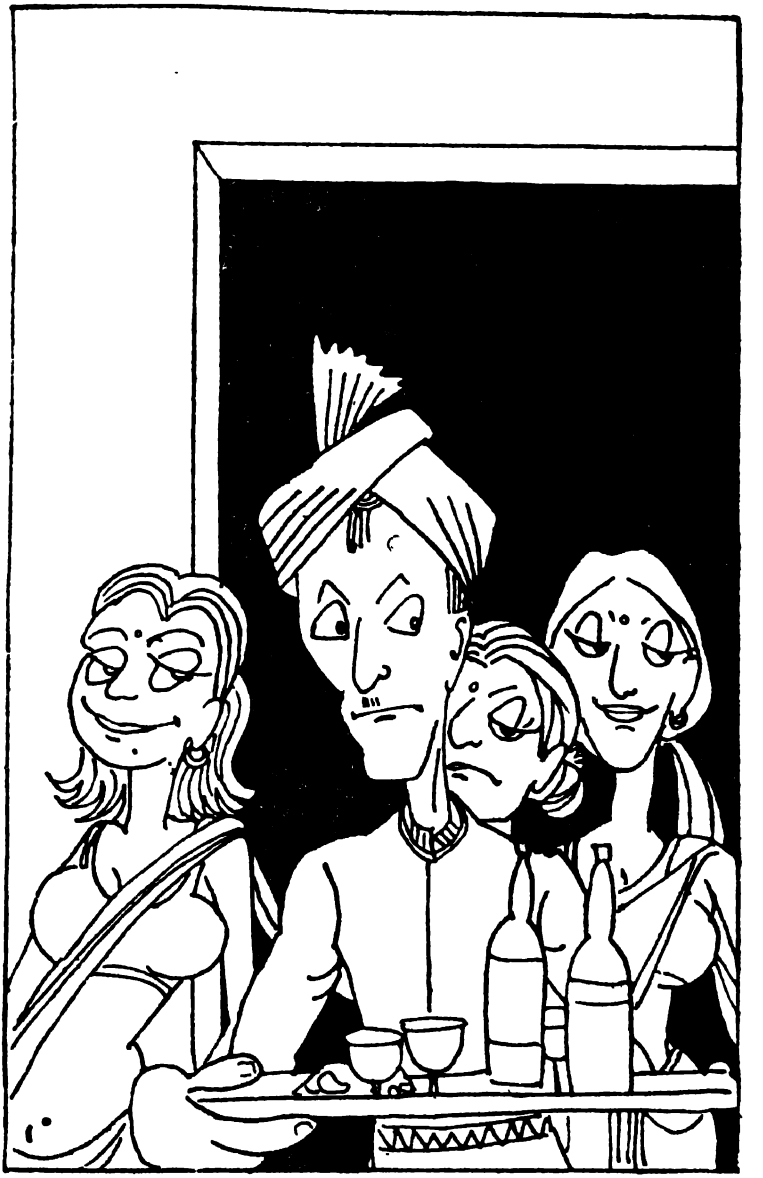

বেয়ারা প্রকাশ করে।

'আমার কোনো ইত্যাদি চাইনে।' দর্শনমাত্র আদিতেই আমার ইতি।

'যাচ্ছি নেপাল—পশুপতিনাথ দর্শনে। তীর্থপথে কোনো পাশবিক ব্যাপারে আমি লিপ্ত হব না।' দিল্লীওয়ালাও বিমুখ।

'আমার কিন্তু একজন সঙ্গিনী চাই। চাই-ই। আহার এবং ওষুধ —দুই আমার দরকার।' বোম্বেওয়ালা বলে: 'ওষুধ না হলে আহারে রুচি হয় না আমার।'

তাঁর পছন্দসই একজনাকে তিনি বেছে রাখলেন, ডাকলেন— 'আসুন, আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে বসলে কৃতার্থ হব।'

আর মেয়েটি বসতে না বসতেই তাঁর প্রস্তাব—'আমরা কিন্তু একটু বাদেই কাঠমাণ্ডু রওনা হচ্ছি—এক বন্ধুর মনোপ্লেনে। আপনি যদি যেতে রাজি থাকেন তো সঙ্গী হতে পারেন আমাদের। দিন কয়েক কাটিয়েই আমরা চলে আসব। কেমন রাজি তো? ভালো করে ভেবে দেখুন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' শুনেই মেয়েটি উৎসাহিত: 'ভাববার কিছু নেই। কাঠমাণ্ডু আমার ড্রীম ল্যাণ্ড। কিন্তু সেখানে নামবেন কোথায় আপনারা? কোন্ এরোড্রোমে?'

'তা জানিনে।' আমি বলি, 'তবে এটা জানি যে গোটা নেপালটাই নাকি এক হিপিড্রোম এখন! হিপি—হিপ্—হুররে ব্যাপার।'

'হুররে'—মেয়েটি সায় দেয় আমার কথায়।

'বেশ। আপনি তৈরি হয়ে আসুন তাহলে। চটপট আসবেন।'

'এক্ষুণি। আমি কাছাকাছিই থাকি তো।'

তরুণীর অন্তর্ধানের পর দিল্লীওয়ালা মুখ খুলল, 'মেয়েটি বেশ

স্মার্ট। আপটুডেট।···কিন্তু দেবদর্শনে যাবার পথে এই বাধা পড়াটা···।'

'বাধা পড়া কোথায়? বাঁধা পড়াও নয়, পথচলতি এসব তো বাঁধাধরা। ধরে নিতেই হয়।' বক্তব্য বোম্বাইওয়ালার।

'দেবদর্শনের পথে দেবীদর্শনে বাধা কোথায়!' আমি বলি। 'কিন্তু আমি ভাবছি মেয়েটি কে? কোত্থেকে আনলো একে?'

'এই শহরেরই কোনো কল্‌গার্লটার্ল হবে—হোটেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিম্বা এই হোটেলেই থাকে হয়ত, কাস্টমারদের দরকার মত সাহচর্য দেয়।' দিল্লীওয়ালার আন্দাজ।

'কিম্বা হোটেলের ডিনার হলে খাবারের সময় নাচে যারা সেই কাবারে নাচওয়ালীদের কেউ হতে পারে।' বোম্বেওয়ালা বাতলায়।

'যাই হোক, অখাদ্য কিছু নয়, তা ঠিক।' আমি বলি—'আর হয়ত ঐ কাবারেও আছে। আমাদের কাবার না করে ছাড়বে না নিশ্চয়।'

'ওসব উল্টো কথা রাখো তো!' বোম্বেওয়ালা বীয়ারের পাত্রে উচ্ছ্বসিত হল: 'কাবার আবার কিসের হে! এই তো জীবন! সঙ্গিনী সুরা আর রঙীন মুহূর্ত যত। সুখ তো এই। সুখ বলতে আর কী বোঝো তোমরা?'

'সুখ? আমার মতে সুখ হচ্ছে সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরে নিজের গৃহকোণটির আরাম-কেদারায় রেডিয়ো কি টেলিভিশন খুলে বসা।' দিল্লীওয়ালা বলল—'এই হচ্ছে সুখ। যৎপরোনাস্তি। এর ওপরে আর নেই। তোমার মতে সুখ কী ভাই?' আমার কাছে সে জানতে চাইল তারপর।

'রঙীন মুহূর্তও না, সঙ্গীন মুহূর্তও নয়। আমার বিবেচনায়, এই

দুয়ের ফাঁড়া কাটিয়ে ওঠাটাই সুখ। শান্তিই হচ্ছে সুখ আসলে। সুখশান্তি বলে না? শুকসারির মতন তারা সব সময় যুগপৎ—সর্বদা ওতোপ্রোতো—আমার ধারণা।'

'যেমন? যথা? দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করহ।'

'যেমন ধরো আরামে ঘুমোচ্ছি। ভোর রাতে সদর দরজায় কড়া নাড়া। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াতেই সামনে হাতকড়া নিয়ে সশস্ত্র পুলিস! কী ব্যাপার? আপনি অমুক তো? এগিয়ে এলো ইনসপেকটার—আপনার নামে এই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। মিসায় আপনাকে আটক করা হোলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য। আমি কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলাম—'আপনাদের একটু মিসাপ্লিকেশন হচ্ছে'··· 'মিস্ অ্যাপ্লিকেশন? তার মানে?' 'তার মানে, মিসা প্রয়োগটা ভুল হয়নি আপনাদের, একটুখানি কেবল মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হচ্ছিল। সামান্যই ভুল যদিও। তবু বলতে হয়, আমি ঠিক অমুক নই—ওই অমুক শ্রী নই। উনি থাকেন পাশের বাড়িতে।···বুঝলে ভ্রাতৃবৃন্দ! সত্যিকার সুখের স্বাদ কী সেটা ঠিক সেই মুহূর্তেই টের পাওয়া যায়, আর, আমরা তা জানতে পাই কলকাতায় বসেই—প্রায় প্রতিদিনই।'

নেপাল বোধহয় আমাদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিম্বা হয়ত পশুপতিনাথই বিমুখ হবেন।

সীমান্ত না পেরুতেই আমরা তুষার ঝঞ্ঝার মুখে পড়লাম। পাইলট বন্ধুটি সুদক্ষ চালক সন্দেহ নেই, কোনোরকমে ঝড়ের টাল সামলাচ্ছিলেন, কিন্তু প্লেনটা হঠাৎ বাঁই বাঁই করে নীচের দিকে নামতে শুরু করল।

'কী হোলো, কী হোলো হে ?' চেঁচিয়ে উঠলাম সবাই।

'কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক—প্লেনটা ভারী বেগরবাঁই করছে। ইঞ্জিন বিগড়েছে বোধহয়। তোমরা প্যারাস্যুট বেঁধে তৈরী হয়ে নাও, লাফিয়ে পড়তে হবে এক্ষুণি।'

সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি আমরা।

বোম্বেওয়ালা পার্শী মুসলমান—আল্লা হো আকবর! বলে তক্ষুণি তিনি লাফিয়ে পড়লেন সবার আগে।

বন্দে মাতরম চীৎকার করে দিল্লীওয়ালাও ঝাঁপ দিলেন তার পরেই। তারপর জয় মা কালী বলে মেয়েটি···সেই মেয়েটি! ধাক্কা মেরে ফেলে দিল আমাকে।

বলবত্তায় হনুমত্তায় আমি স্বভাবতই একটু পিছিয়ে, লম্ফ ঝম্পে একটু আগু-পিছু করছি দেখে···বোধহয় সে ঠেলে দিয়েছিল আমায়।

দুর্গা দুর্গা !! পড়তে পড়তে আমি আওড়ালাম।

জয়হিন্দ্ বলে সবশেষে লাফিয়ে পড়ল পাইলট।

প্যারাচুটের ছাতা খুলে আমরা ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়লাম। ছড়িয়ে পড়ে তারপরে নিজেদের কুড়িয়ে বাড়িয়ে সবাই আমরা একজোট হলাম এক জায়গায়।

কোথায় যে নামলাম তার ঠাওর হচ্ছিল না ঠিক। কোথায় জায়গাটা ? নেপালে, ভূটানে, না সিকিমে ? নাকি সেই তিব্বতেই ? তুষারাবৃত প্রান্তরে কিছু বুঝবার যো নেই।

জনমানবের চিহ্ন নেই কোনোখানেই। এমনকি, কোনো তুষার মানবকেরও না। অকুস্থলে এই দুঃসময়ে নিদেন একটা ইয়েতির পাত্তা পেলেও বুকে বুঝি একটু বল মিলত, আশ্বস্ত হওয়া যেত একটুখানি।

পাইলট বন্ধুটি বললেন, 'লাফাবার আগে আমি বেতারে সংকেত পাঠিয়েছি। এখন সেই এস ও এস পেয়ে কেউ যদি সাড়া দেয় এসে! এই পথের কোনো প্লেন যদি ধেয়ে এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় আমাদের—তবেই বাঁচোয়া। নইলে, কী যে অদৃষ্টে আছে কে জানে!'

'তিলে তিলে মরতে হবে না খেয়ে, আবার কী?' বলল বোম্বাই-ওয়ালা।

'আমি কিন্তু নামবার আগে খাবারের ব্যাগটা নিয়ে লাফ দিয়েছি।' মেয়েটি জানায়।

'বাহাদুর! বাহাদুর!!' সাবাস দিলো দিল্লীওয়ালা বন্ধু।

সব মেয়ের মধ্যেই যেমন মাতৃত্ব লুকোনো তেমনি এক গিন্নী-বান্নীও যেন ঘাপটি মেরে থাকে কোনোখানে, আমার ধারণা হোলো।

দিন কয়েক কাটলো আশা নিরাশায়। কিন্তু কোনো দিগন্তেই কোনো প্লেনের ইশারা মিললো না, সাহায্যকারীর সাড়া নেইকো কোথাও।

এদিকে আমাদের খাবার-দাবারও ফুরিয়ে এলো আস্তে আস্তে।

আরো কদিন এইভাবে কাটলে পর আমাদের পাইলট বন্ধুটি কথা পাড়লেন—'এমন অবস্থায় আমি একটা উপায় বাতলাই। আমার প্রস্তাবটা তোমরা ভালো করে ভেবে ছাখো। এছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না। না খেয়েই বেঘোরে বিভুঁয়ে মরতে হবে সবাইকে। তার চেয়ে আমি বলি কি···এই নাচার দশায় এছাড়া তো আর কোনো পথ দেখি না···বাঁচার এই একটা পথ। এমন অবস্থায় শেষ প্রশ্নটির চূড়ান্ত এক সমাধান।'

মূক জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে চারজনই আমরা মুখর।

'আমি বলছিলাম কি, আমি নিজেকে তোমাদের জন্যে বলি দিই বরং। আমার মাংসে তবু কদিন টিকে থাকতে পারবে তোমরা। যে কদিন হোক। এ বিষয়ে তোমাদের কী মত?'

দিল্লীওয়ালা এ কথায় চুপ করে রইল। দিল্লীর লাড্ডুর মতই বুঝি ঠেকল তার কাছে কথাটা।

বোম্বেওয়ালা বলল, 'কথাটা মন্দ নয়! অন্ততপক্ষে মন্দের ভালো বলা যায়, কিন্তু তাহলেও, মুখ ফুটে এতে সায় দিতে আমার বাধছে ভাই।'

আমার মতামত কী জানাব? চুপ করে রইলাম।

'মাংস ছাড়াও, আমার জামা কাপড়গুলোও তোমরা কাজে লাগাতে পারবে তাহলে।'

'কী কাজে লাগবে? তোমার জামা কি আমাদের গায়ে ফিট করবে? তোমার এই প্যান্টেও আমার কাজ নেই। আমি তো ধুতি পরি। দেখছ না?'

'কাজে লাগবে এই'—পাইলট পরিষ্কার করে: 'ভাগ্যক্রমে এধার দিয়ে যদি কোনো প্লেনটেন যায় আমার ওগুলোয় আগুন ধরিয়ে নিশানা দিতে পারবে, রক্ষা পেয়েও যেতে পারো চাইকি—ভগবানের অনুগ্রহ থাকলে।'

এরপর বেশি বাক্যব্যয় বাহুল্য বোধে পাইলট পকেট থেকে পিস্তল বার করে নিজের ললাট লক্ষ্য করল—আওড়ালো, 'এক—দুই—'

'থামুন থামুন! দাঁড়ান, ওভাবে নিজের মাথা খাবেন না, দোহাই!' চেঁচিয়ে উঠেছে মেয়েটা।

'কী হয়েছে?' পিস্তল নামিয়ে জানতে চাইলো পাইলট: 'বাধা দিচ্ছেন কেন? এছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না...'

'না, বাধা দিচ্ছি না আপনাকে, আপনি কপাল ছাড়া আর কোথাও তাক্ করুন। গলায় কিম্বা আরও তলায়—আপনার বক্ষ স্থলেই লক্ষ্য স্থির করুন বরং!' মেয়েটির অনুরোধ।

'মানে?' পাইলট অবাক হয়ে জানতে চায়।

'মানে মাথাটা আপনার বাঁচাতে বলছিলাম। এই আর কী!'

'কেন, মাথা বাঁচিয়ে কী লাভ? আপাদমস্তক মারা যাচ্ছি যখন?' অন্তিমমুহূর্তেও তাকে যেন একটু বিস্মিত হতে দেখা যায়।

'মাথার ঘি-টা ওভাবে বর্‌বাদ করবেন না। পায়ে পড়ি, ওটা আমার প্রিয় খাদ্য। তাই বলছিলাম।' তরুণী জানালো।

'আহা, সে রুই মাছের মাথা হলেই না? মাছের মাথার ঘি সত্যিই উপাদেয়। খেতে বেশ। তারিয়ে তারিয়ে খাবার। সবাই খায়, সবাই খেতে ভালোবাসে, আমিও খাই।' আমি জানাই।

'ঘি যদি অতো সরেস হয় ঘিলু না জানি আরো কতো!' মেয়েটি বলে: 'কখনো খাইনি তো! সেই সুযোগটা যখন এলোই চোখ বোজার আগে সেটা চেখে যেতে চাই। তাই খেয়ে মরতে হলেও আমার দুঃখ থাকবে না। আমি কৃতার্থ।'

মেয়েটির মুখ চোখের ভাবভঙ্গী দেখে আমার বোধ হলো, এই প্রথম না! মেয়েটি অনেক ছেলের মাথা খেয়েছে এর আগে।

আমার স্বগতোক্তি তার সম্মুখে সোচ্চার হলো না অবশ্যই!

ইচ্ছাপূরণ

সকালের কাগজ খুলতেই বিজ্ঞাপনের খবরটায় নজর গেল।

'হারাইয়াছেন—একটি প্রায়বৃদ্ধ ভদ্রলোক, বেঁটে এবং লম্বা, দাঁত নেই, চুল নেই, শরীরে তেমন শক্তি নেই, মোটের উপর প্রায় সব কিছুই তিনি হারিয়েছেন···সংবাদ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব, ফোন নম্বর সাত শো তের।'

এক নজরেই বুঝেছি যে সব কিছু খোয়ানোর পর নিজেকেও খোয়ালেন যে ভদ্রলোক তিনি আমাদের আলুমেসো ছাড়া আর কেউ নন—টের পেয়েছি সাত সতের না ভেবেই।

তার ওপরেও সাত শো তেরয় ফোন করে নিশ্চিত হওয়া গেল।

'···হ্যালো, আলুমাসি?'

'কী বলছিস বল।'

'কী হোলো আলুমেসোর? সব কিছু হারিয়েছেন, তার পরে নিজেকেও হারিয়েছেন আবার? নিজেও হারিয়ে গেলেন শেষটায়?'

'খবরের কাগজে দেখেছিস তাহলে বিজ্ঞাপনটা?'

'হ্যাঁ, দেখলাম তো। পড়েই মালুম হয়েছে যে ইনি আমাদের আলু-মেসো ছাড়া কেউ না। কিন্তু খটকা লাগল এক জায়গায়, বেঁটে এবং লম্বাটা কী? একাধারে বেঁটে আর লম্বা হয় নাকি?'

'হয় নাকি, তার মানে? হয়ে রয়েছে যে! তুই বলছিস কী! অ্যাঁ? জলজ্যান্ত চোখের ওপর, আর তুই বলছিস—হয় না?'

'আহা তা নয়,···দাঁড়াও, আমি আসছি।'

ছুটলাম, কাগজখানা হাতে করেই।

গিয়ে দেখি তিনি ধরাশায়ী। যে পতিবিয়োগে সতীরা পাথর হয়ে যান তার বিরহে কাতর হওয়া কিছু বিস্ময়ের না, পতির অভাবে ক্ষতি-বোধ করাটা স্বাভাবিক, অলুমাসিকে একটু আলুথালু দেখতে পাব সেটা আশা করেই গেছি, কিন্তু তাঁকে যে এতটা আলুলায়িত দেখব তা আমার আশা ছিল না ঠিক।

তিনি কেবল অঙ্গসজ্জাই ছাড়েননি, একেবারে ভূমিশয্যায়।

'খাট থাকতে মাটিতে শুয়ে কেন মাসিমা?' সহানুভূতিভরে শুধাই: 'শুকনো মেজেয় পাশ ফিরতে হাড়ে লাগবে যে! খট্টাঙ্গেই তোমার খট খট করে গায় লাগে তাতে এই মাটির ওপর এতটা বয়েসে এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি কি পোষাবে তোমার?'

'কী সুখে খাটে শোবো বল? আমার সুখ সাধ সব চলে গেছে···' ফোঁস্ করে এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।—'কে আছে আমার? কী আছে আর?'

'তা বটে।' আমি বলি। তার বেশি আর কথা জোগায় না নিজের ঘটে।—'স্বামী গেলে সাধ্বী রমণীর কী থাকে আর? তা বটে। কিন্তু এখনো তো যায়নি সত্যিই!'

'আর কী ওঁকে ফিরে পাব তুই ভাবিস?' দ্বিতীয় দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে তিনি কন—'হ্যাঁ, বেঁটে লম্বার কথা কী বলছিলিস তখন?'

'আমি কেন বলব? তুমিই বলেছো তো। কাগজে ছেপে দিয়েছ —ছাখো না! বেঁটে কি কখনো লম্বা হয়?'

'হয় না? তবে হলো কী করে? তা যদি না হয় তো কী হবে তাহলে?'

'লীন অ্যানড থীন। খর্বকায়, ক্ষীণ। আমি না হয় আলু মেসোকে দেখেছি, টের পেলুম। কিন্তু আর কেউ এর থেকে কোনো মাথামুণ্ডু বের করতে পারবে না। বিজ্ঞাপনে সব বিশদ করে লিখতে হয়, জানো মাসি?'

'তা তো জানি, কিন্তু এক কাঁড়ি টাকা লাগে তার জন্যে, তা জানিস? খবরকাগজে বিজ্ঞাপনের যা চার্জ না! কথায় কথায় টাকা। ঐ ক' লাইন দিতেই যা লেগেছে না! কী বলব তোকে!'

বলতে হয় না। ঐ চারলাইনের দরুনই তাঁর পার্সের ওপর দিয়ে যে দারুণ চাড়টা গেছে তাঁর নাচার মুখেই তা প্রচার পায়।

'তোর মেসোকে নিয়ে সারা জীবনটা যা খোয়ার আমার হলো না!...' তার বেশি তাঁর কথা যোগায় না আর!

তার পরে তিনি এই নিজে খোয়া গিয়ে এত টাকা খোয়ানোর কারণ হয়ে, গুহ্য কথাটা আলুমাসি উহ্য রাখলেও আমি বুঝতে পারি, বোঝার উপর শাকের আঁটির মতই, উটের পিঠে উপরি তৃণটির ন্যায় মাসীমাস্ত প্রদেশ পার হয়ে গেছেন।

'তুমি কিছু ভেব না আলুমাসি', আমি সান্ত্বনা দিই, 'তোমাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে বেশি দিন তিনি কখনো থাকতে পারবেন না। ছাখো না, ফিরে এলেন বলে। তুমি কিচ্ছু ভেব না।'

একদা যৌবনে যে দেহযষ্টির সুষমায় মেসোমশাই অন্ধ ছিলেন আজ উত্তর ষষ্টিতে পৌঁছে সেই যষ্টিমধুর মাধুর্য কমে যষ্টিত্ব বেড়ে গেলেও এখন তা অন্ধের যষ্টিই! এই প্রায়ান্ধ বয়েসে সেই নড়ি বিহনে মেসোর কি এক পা নড়িবার জো আছে?

মাসিমাকে সেই আশ্বাস দিতেই তাঁর আরেক দীর্ঘশ্বাস! 'আমার তো আশা হয় না রে তিনি ফিরবেন আবার!'

'তোমায় ছেড়ে কোথাও গিয়ে বেশি দিন থাকা তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আচ্ছা, কোথায় তিনি যেতে পারেন তুমি আন্দাজ করো? ...ডালুমাসি শালুমাসির ওখানে খোঁজ নিয়েছ?'

'কোথায় তারা! শালু তো এখন দিল্লিতেই! আর তোর ডালুমাসি তো রাঁচিতে গিয়ে হোটেল খুলেছে...'

'জানি তো। বোনপো বোনঝিদের সবাইকে সেখানে যেতে তিনি সেধেছিলেন। গেছলামও আমরা...আমি...বিনি সবাই! হোটেল না বলে অন্নছত্রই বলা যায়। চলছিল বেশ, হঠাৎ ইতু সেখানে গিয়ে সব ছত্রভঙ্গ করে দিল শেষটায়। সে হোটেল উঠে গেছে কবে! ডালুমাসি একটা রিকশা ডেকে দিল্লি চলো হেঁকে দিল্লির হাইরোড ধরে বেরিয়ে পড়লেন দেখে এসেছি। এতদিনে শালুমাসির আস্তানায় গিয়ে পৌঁছেচেন নির্ঘাৎ!'

'সে তো তুমি জানো।' আমার পুনরুক্তি: 'ইতুর থেকে ইত্যাদি বইয়ে সে কাহিনী তো লিখেই দিয়েছি, পড়োনি?'

'পড়ব না কেন? কিন্তু দিল্লী কোথায়! তার পরের ঘটনা তুই জানিস নে, তোর ডালুমাসিকে দিল্লী পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া চারটি না! পারবে কেন রিকশাওয়ালা! রাঁচির কাছাকাছি হিলি বলে একটা জায়গা আছে, খবর রাখিস? সেখান অবদি টেনে নিয়ে যেতেই লোকটির জিব বেরিয়ে পড়ল! তোর ডালুমাসি তো কম খানি লাশ নয় রে। আমার মতন প্যাকাটি নাকি?'

ডালুমাসি আমাদের হাড়ে মাসে কিঞ্চিৎ 'ম্যাসিভ' হলেও সরাসরি তাঁকে লাশ বলাটা আমার কেমন যেন মনে হয়! নিজের দেহের প্রতি কটাক্ষ করে একটু গায়েই লাগে আমার।

'তাই নাকি? তা তিনি এখন সেই হিলি স্টেশনেই পুঞ্জীভূত

হয়ে রয়েছেন ?'

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাসে নিজের নাসিকা-পথে যে ঘূর্ণীবাত্যা ছাড়লেন আমাকে উলটে ফেলে সেই অনুনাসিক ঝাপটার নাসিক শহরে গিয়ে পৌঁছবার কথা।

'আর কোনো দুঃখু নয় রে! তিনি বেঁচে থাকতেই আমার কপাল পুড়লো এই দুঃখুটাই আমার খুব।' ডুকরে ওঠেন মাসিমা।—'আমি বেঁচে থাকতেই তিনি আমায় ছেড়ে গেলেন!'

'কোথায় যাবেন আর!' আবার আমার সান্ত্বনাদান।—'কিছু-দিনের জন্যে একটুখানি মুখ বদলাতে গেছেন কোথাও।'

'মুখ বদলাতে? কেন, আমি কি এতই খারাপ হয়ে গেছি দেখতে? আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না আর?'

'না না, সে কথা বলছি কি! সে মুখ বদলানো বলিনি। অন্য এক মুখ বদলানো আছে না? ভালো মন্দ মুখে দিয়ে যেটা বদলাতে হয়?' আমি প্রাঞ্জল করি—'তুমি যে খুব খারাপ রাঁধো তা আমি বলছিনে, তবে খুব ভালো রান্নাও দিনের পর দিন খেলে একঘেয়ে লাগে না? মেসোমশায়ের তাই হয়েছিল মনে হয়। অরুচি ধরে গেছল। তাই··· এমন কি আমরাও তোমার বোনপোরাও যে ততটা ঘনঘন তোমার কাছে আসি না বলে তুমি দুঃখ করো যে তার কারণও ঐ!'

'ঐ মানে? তোরা বুঝি খাবার লোভেই মাসিদের বাড়ি যাস? আমার রান্না না খেয়েই অরুচি ধরে গেল তোদের!···তোদেরও?'

'না, সে কথা নয়। তোমার রান্নার সুখ্যাতি শুনেছি তো! তাই তার সোয়াদে মুখ মরে যায় অরুচি ধরে যায় পাছে—সেই ভয়েই আসি না। আর সবার কথা জানিনে, আমার কথাটাই বলছি আমি।' বলে কোনো রকমে সামলে নিই কথাটা—'আমার মনে

হয় ইতুর কাছেও যেতে পারেন মেসোমশাই। মুখ বদলাতে হলে আমরা সবাই সেখানেই যাই তো। তাদের বাড়ির ছাদে হাঁসমুর্গির কারখানা। মুর্গির লালসায় আলুমেসো তার আস্তানাতেই গেছেন হয়ত।'

'ইতুর কাছে পাটনায়?'

'সম্ভব। তবে তাঁর শালীদের কাছে যাওয়াটাও অসম্ভব নয়।' মেসোমশাইয়ের শালীনতার আমি প্রশস্তি গাই।

'তাহলে যা তুই। এত করে বলছিস যখন···তোর ডালুমাসি শালুমাসির কাছে গিয়ে ছাখ গে! ইতু-টিতুর ওখানেও যাস। যেখান থেকে পাস ওঁকে ধরে নিয়ে আমার পাশে এনে দে। প্রাণ বাঁচা আমার!'

মাসিমা তো বলেই খালাস। কোথায় হিলি কোথায় দিল্লী আর কোথায় বা পাটনা! অতদূর স্বপ্ন দেখাটাও আমার কাছে এক বিলাস!

'কিন্তু মাসিমা, হিল্লি দিল্লি পাটনা তো চাট্টিখানি না···।'

'ঐ ড্রয়ার টেনে ছাখ, যা দরকার লাগে, নে!···আমি আর উঠতে পারছি না। এই যে মেজেয় শুয়েছি, এখেনেই আমার দেহ রাখব।'

'বালাই ষাট!' বলে আমি ড্রয়ার টেনে দেখি। ছোট বড়ো মেজ নানা আকারের নোটে ফাঁকা পকেট বোঝাই করে বেরিয়ে পড়ি আমি তক্ষুনি।

গোড়াতেই পাটনা যাই। বাসার একঘেয়ে রান্নায় অরুচি ধরেছিল আমার, আমারো, সবার আগে ইতুর কথাটাই মনে পড়ল তাই।

শালুমাসির ডালে না গিয়ে ডালুমাসির পাল্লায় না ডাল গলিয়ে

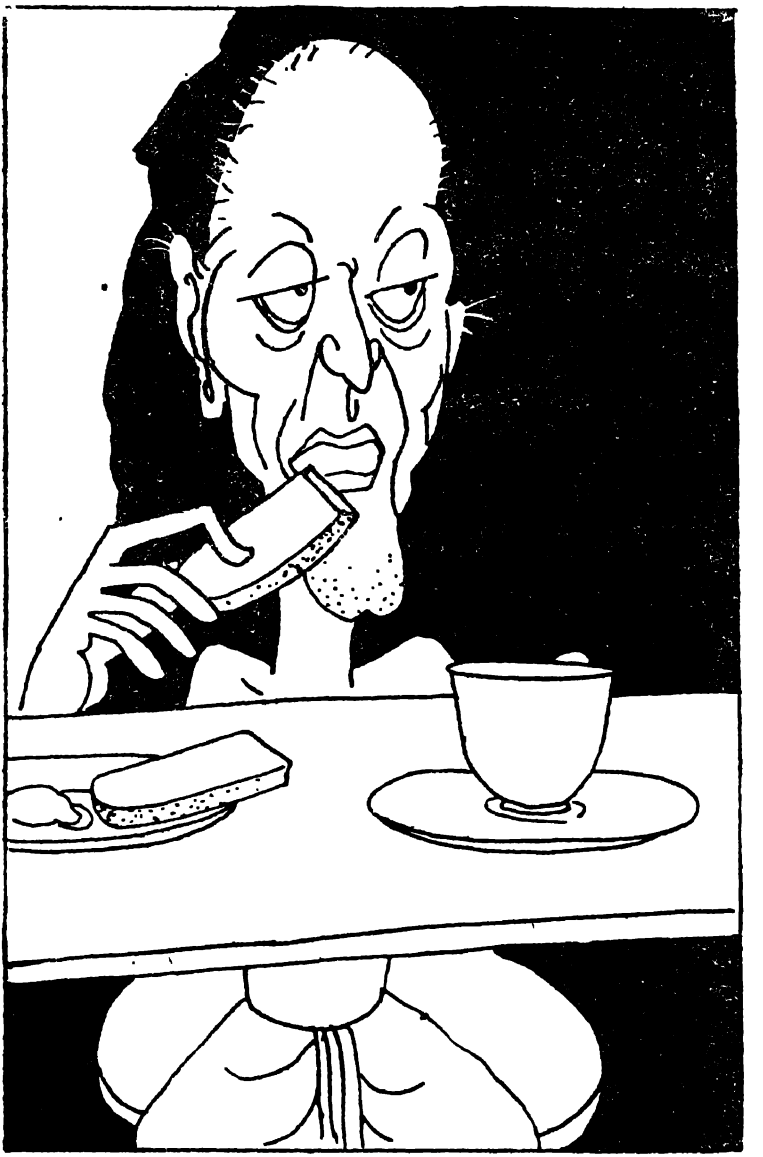

সোজা চলে গেলাম ইতুলক্ষ্মীর পাটনায়।

গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তাই। প্রাতরাশের টেবিলে ইতুর মুখোমুখি দেখতে পেলাম আলুমেসোকে—চা অমলেট টোস্ট পোচ পুডিংয়ের সম্মুখে। হাতে মুখে মাখম মাখামাখি।

ভাগ বসালাম গিয়ে। ভাগ্যে থাকলে মিলে যায় অমনি।

'কোনো খবর না দিয়েই হঠাৎ এমন আচম্‌কা…?' শুধায় ইতু: 'ভালো আছো তো? সবাই ভালো বেশ?'

ঘাড় নেড়ে জবাব দিই—'হ্যাঁ, সকলেই বহাল তবিয়তে। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, মানে এই লাইন দিয়ে…ফিরছিলাম দিল্লীর থেকে…পাটনা স্টেশনের হাঁক না শুনেই টনক নড়ল…নেমে পড়লাম তক্ষুনি। তোর রান্না স্বর্গীয় মুর্গীরা মনে পড়ে গেল সব।'

ইতু হেসে বলল, 'ঘন ঘন টনকটাকে নড়াও না কেন গো?'

প্রাতরাশের পর ইতুচন্দর আমাদের মধ্যাহ্নের আশ মেটাতে রান্নাঘরে গেলে একলাটি পেয়ে শুধালাম মেসোকে—'আলুমাসির নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনটা দেখেছ?'

'দেখেচি। কিন্তু আমি আর ওমুখো হচ্ছিনে বাবা!'

'এদিকে মাসি যে ধরাশয্যা নিয়েছেন।'

'নিন গে। আমি আর ওই ধরা-বাঁধার মধ্যে যাচ্ছিনে।'

'ধরাবাঁধাটা কিসের! মাসিমা কি তোমায় বেঁধে রাখেন নাকি?'

'ধরাবাঁধা খাওয়া! দিনের পর দিন খালি আলু আর আলু! আলুকে দেখে দেখে আর আলু চেখে চেখে জীবনটা আমার আলুনি হয়ে গেল। অরুচি ধরে গেল আমার…'

'তা বটে, ঐ আলুর ভয়ে পা বাড়াইনে আমরাও! আলুর প্রতি মাসিমার দরদ একটুখানি বেশি তা মানি, তা নাকি ওঁর সেই

ছোটবেলার থেকেই এই রকম শুনেছি! তাই ঐ আলু নামটা ওঁর চালু হয়ে গেছে সেই থেকেই…!'

'চালু বলে চালু! ভাতে আলু ডালে আলু তরকারিতে আলু! ঝালে ঝোলে অম্বলে আলু! আলু পোস্তো আলুচোসতো, আলু ছেঁচকি, আলু ছ্যাঁচড়, আলু মরীচ! আলুর পায়েস—আলুর হালুয়া—এমন কি! আলু ভাজার থেকে আলুর পাঁপড় কিছু বাদ নেই।'

'আর আলু কাবলি মেসোমশাই? সেটা কি খেতে ভালো নয়? বলুন?'

'কেবল আলু কাবলি হলে তো রক্ষে ছিল, আলু বেলুচিও আবার। লুচির মধ্যে আলু পুরে…কি করে যে পারে খোদাই জানেন। আলুর পুর দেওয়া সেই লুচিকে বলে কিনা আলুপুরি। খেয়েছিস কখনো? ডালপুরির মতই অনেকটা। এমন অখাদ্য!'

'আলুর প্রতি মাসিমা একটু দয়ালু তা জানি, তাই বলে কি মাসিমাকে তুমি ত্যাজ্যপুত্তুর করে দেবে?'

'সে-ই আমাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করে দিক না! আমি এখানে মুখ বদলাতে এসেছি, আর ওর সম্মুখে যাচ্ছিনে।'

'সেদিক দিয়ে মুখ বদলাবার জায়গা এটা বটে। ইতুর মুখখানা এখনো চাঁদপানা, তাই না? আর ওর টুলটুলি ঘুলঘুলিকেও বলতে হয়। ওর আদলে বানানো নয়?'

'তোরা জানিস। মুখটুখ আমার চোখে পড়ে না—এখন আমি অস্তোন্মুখ, যা কিছু পড়বার তা এখন আমার মুখেই পড়ে। এই মুখে…' বলেই পুডিং-এর তালটা সেই মুখে তিনি সামলালেন।

'হ্যাঁ, জানিস রে? এখানে এসে অবদি শুনছি, এই বিহারে ইচ্ছা-পূরণের কূয়ো আছে নাকি কোথায়, সেখানে গিয়ে হত্যা দিয়ে

পড়লে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় সব। তোদের তারকেশ্বরে যেমন হত্যা দেয় না?'

'পৌরাণিক সেই বাঞ্ছাকল্পতরুর মতই?'

'হ্যাঁ। তোর বিশ্বাস হয়?'

'বাঞ্ছাকল্পতরু কোথাও আছে বলে আমি জানি না। তবে একালে বাঞ্ছাকল্পতরুণী আছেন তা মানি। তাঁরাই এখন সবার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।' আমি বলি—'তা, তুমি তার খোঁজে রয়েছো কেন জানতে পারি?'

'আনকোরা হবার জন্যই, আর কেন? সেখানে গিয়ে পুনর্যৌবন চাইব আমি, আর তারপরে…'

'শুধু মুখ নয় আপাদমস্তক বদলাবার মতলব তোমার? তারপরে তরুণ হয়ে কোনো বাঞ্ছাকল্পতরুণীকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতবে? বুঝেছি।'

'তুই বলিস কী রে? দিল্লীর লাড্ডু খাবার জন্য মুখ বাড়াবো আবার?' তিনি গালে হাত দেন। নিজের গালে।

'সেটা এমন খারাপ কী, মেসোমশাই? নতুন ঘর নতুন ঘরনী না চাও আলুমাসিকেও তোমার সঙ্গে নাও না কেন! দু'জনেই আগা-পাশতলা বদলে নতুন করে লাগাও ফের আবার।'

'সে কথাটা মন্দ না। তবে তুই আবার চ না কেন আমাদের সঙ্গে—হত্যা দিবি কূয়োতলায় গিয়ে!'

'কিসের জন্যে? পুনর্যৌবন? বার্ধক্য কষ্টদায়ক তা জানি কিন্তু যৌবনজ্বালা যে বেজায় তাও আমার জানা আছে মেসোমশাই। তা আমার চাই না। তবে হ্যাঁ, পুনঃ কৈশোর যদি ফিরে পাই তবে আবার…সে বয়েসে বেশ শোরগোল। আর বাঞ্ছাপূরণের

কথা কইছো? কোনো মনোবাঞ্ছাই আমার অপূর্ণ নেই তেমনটা। সব সাধই মিটেছে, সব রকম আস্বাদই পেয়েছি অল্প-বিস্তর। অন্ধ-কূপহত্যা হতে যাব কোন দুঃখে?'

'না যাস নাই যাবি। বেশ, ফিরে গিয়ে তোর মাসিকেই পাঠিয়ে দে না হয়। আমি এদিকে কূয়োটার খোঁজখবর নিচ্ছি।'

কলকাতায় ফিরেই মাসিকে গিয়ে খবরটা দিলাম। দিতেই তিনি টেলিগ্রামের মতই দিল্লীর এক্সপ্রেস ধরতে ছুটলেন তক্ষুনি।

হনৌজ দিল্লী দূর্ অস্ত্। সেই পথেই পাটনা তো! তাকে দুরস্ত করতে হলেও তড়িঘড়ির দরকার।

দিনকতক বাদে আলুমেসোর খবর পেতেই ছুটে গেছি তাঁদের নিউ আলিপুরের আস্তানায়।

আলু মেসো ঠিক সেইরকমটাই আছেন—আলিপুরের মতই। নিউ-ত্ব কোথাও দেখা গেল না।

ইতুর নিউজ চাইলাম।—'কেমন আছে ওরা?'

'যেমন থাকে। দস্তুর মতন দিব্যি। বহাল তবিয়তে সবাই।'

'আলুমাসিকে দেখছিনে। থেকে গেলেন নাকি সেইখানেই?'

'বলা যায় একরকম। শোন বলছি···মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সেই কল্পতরু কূয়োর কাছে গেছি দুজনায়···রাজগিরের কাছাকাছি গভীর গহনের ভেতরে সেই কূয়ো।···'

'হত্যা দিয়েছিলে তোমরা?'

'হত্যা ফত্যা দিতে লাগে না। সেই কূয়োর জলে মুখ দেখে মনে মনে চাইলেই নাকি ফলে যায়···'

'সত্যি?'

'মিথ্যে নয় বলেই তো মনে হচ্ছে। হয়েছিল কী, শোন তবে।

গেলাম দু'জনায় কূয়োতলায়। মুখ বাড়িয়ে তাকালাম আমরা। অতলস্পর্শী কূয়ো, জলটা এত তলায় ভাল করে মুখ দেখা যায় না। যাই হোক সেই আবছা আবছা জলের আবছায়ার ওপর যেটুকখানি মুখের ছায়া পড়ল দেখলাম।'

'আলু মাসিও দেখল?'

'দেখল বইকি। আরো ভালো করে দেখবার জন্যে যেই না ঝুঁকেছে, আমি সাবধান করতে গেছি···এই করছো কী! কূয়োভ্যাডিস?···আচ্ছা কূয়োভ্যাডিস কি কোন মন্তর-টন্তর নাকি?'

'তা জানিনে। ফ্রেঞ্চ কি লাতিন তাও আমি বলতে পারব না, তবে কথাটা সাংস্কৃতিক। সংস্কৃতের মতই অনেকটা। কথায় কথায় অং বং এর মতন ওই সব আওড়ালে, তাকে কৃষ্টিবান বলে ভাবে সবাই। তার মানেটা বোধ হয়, যাচ্ছ কোথায়।'

'তাই বটে! কোথায় গেল যে—সত্যি! সংস্কৃত মন্ত্রের মতই কাজ দিল কথাটায়। যেই না বলেছি কূয়োভ্যাডিস আর অমনি কিনা ঝপাং···।'

'ঝপাং? তার মানে?'

'তার মানে তোর মাসি সেই কূয়োর একেবারে তলায়। সত্যি বলতে এই সব ইচ্ছাপূরণের কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিনি গোড়ায়। তোর মতন সন্দেহ ছিল আমারো। কিন্তু চোখের ওপর দেখে না, এখনো এমনটা ঘটে থাকে—মনের ইচ্ছা ফলে যায় হাতে হাতে সত্যিই! মিথ্যে নয় মোটে, কিন্তু দেখলাম এখনো ফলে যায়··· সত্যিই! নিজের চোখের ওপর দেখলাম তো—যা চাইছিলাম। তোর মাসি চোখের বাইরে চলে গেল দেখতে না দেখতে, সত্যিই।'

গাছের বিড়ম্বনা

হর্ষবর্ধন তো তাজ্জব, আমিও কম চমৎকৃত হই না।

'আপনি কখনো গাছচালা দেখেছেন?' কথায় কথায় হর্ষবর্ধন যেন গাছ থেকে পড়লেন হঠাৎ।

আস্ত একটা গাছ এনে পাড়লেন মাঝখানে।

'গাছচালা কী?' প্রশ্নটায় আমি অবাক না হয়ে পারি না।

'না, গাছের কোনো চালাকি নয়, তাদের চালচলনের কথাই কইছিলাম।'

'গাছচালা নয় দাদা', গোবর্ধন পাশেই ছিল, বাতলালো সে: 'কিন্তু বিস্তর চালাগাছ দেখেছি আমি দাদা! কিন্তু তাদের গাছচালা বলে না, বলে চ্যালা কাঠ।'

'তুই থাম্।' তাকে ধমক দিয়ে তিনি আমার দিকে তাকান—'দেখেছেন আপনি?'

'গাছের চালচলন মানে তাদের কাণ্ডকারখানা—এইতো বলছেন? মানে তাদের গোড়াগুড়ির থেকেই মাথা তুলে আগার দিকে আগানো, ডালপালা বাগানো, ফুল-ফল ফলানো, শাখা-প্রশাখা-বিস্তার। কাণ্ডকে আরো প্রকাণ্ড করা—এই সব তো?'

'এসব কিসের! এসব তো আপনিই হয়ে যায়। এর মধ্যে গাছের চালটা কোথায়? কোনখানে?'

'গাছের চাল আমাদের চুলোয় দাদা, চ্যালাকাঠ হয়ে আমাদের

ভাত সেদ্ধর কাজে।'

দাদার কথায় আবার মাথা গলায় গোবরা।

'সেসব কাণ্ড নয় মশাই! গাছরা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছামতন ইতস্তত বিচরণ করছে···সেই কথাই আমি কইছিলাম।'

'আমরাই তো গাছতলায় গিয়ে ঘুরি ফিরি, হাওয়া খাই। গাছরা যে ফের ঘুরে ফিরে হাওয়া খায় বা হাওয়া খাবার জন্যে ঘোরে ফেরে, বেড়িয়ে বেড়ায় তা তো আমার জানা ছিল না।···তবে গাছদের কতটুকুই বা আমি জানি! তাদের চেষ্টাচরিত্রের কিছুই আমার জানা নেই।' কবুল করতে হয় আমায়—'এমন কি, ভালো করে কোনোদিন তাদের আমি নিরীক্ষণও করিনি। এসব জানতেন আমার বন্ধু বিভূতি বাঁড়ুজ্যে মশাই, গাছের ধার ধারতেন তিনি। গাছপালারা সব তাঁর এলাকার। গাছদের জন্যে বনে অরণ্যে হন্যে হয়ে তিনি ঘুরতেন, তাদের রূপগুণের তিনি ছিলেন জহুরি। তাদের রূপসুধা পানে তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। গাছের চালচলন তাঁর নখদর্পণে ছিল সব। আপনার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারতেন তিনিই। তিনি এখন নেই।'

'আচ্ছা, না দেখুন, কখনো শোনেনও নি কি গাছচালার কথা?'

'শুনেছি বইকি। এবং সচল অবস্থায় না দেখলেও একটা চালিত গাছকে দেখেওছিলাম ছোটবেলায়—তার চালকটিকে দেখতে পাইনি যদিও।'

'কোথায় দেখেছিলেন?'

'আমাদের দেশ গাঁয়ের এক পোড়ো মাঠে। লম্বা সিড়িঙ্গে গাছ—একটাও ডালপালা নেই তার। কী যে গাছটা তা কেউ বলতে পারে না, চেনাশোনার বাইরে। লোকে বলত কোনো ডাইনি নাকি

গাছটাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছিল একদিন···।'

'চালিয়ে এনেছিল ?'

'মানে চালিয়ে আনুক কি গাছটায় চেপে উড়ে আসুক, এসেছিল সে আমাদের গাঁয়ে, কেন কে জানে। ডাইনি কোথায় তার পাত্তা নেই আর, তবে গাছটা সেই থেকে রয়ে গেছে সেইখেনেই। তার গা থেকে একরকম আঠা বেরয়, সেই আঠায়, গঁদের মতন, আমরা খাতাপত্তর সাঁটার কাজ চালাতাম। খুব কাজের গাছ। আমাদের কাজে লাগে বেশ।'

'বলেন কী ?'

'হ্যাঁ। আমি জন্মের থেকে দেখছি গাছটাকে। আমার বাবাও জন্মের থেকে দেখেছেন। আমার ঠাকুর্দাও। তাঁর বাবা, তাঁর বাবা। তাঁরও বাবা আবার। সাত পুরুষ থেকে দেখে আসছে। সাত পুরুষের গাছ।'

'বাঁশ গাছ হলে বলা যেত কেউ বংশরক্ষা করেছে এক আধারে তারই বংশধারা।' গোবরা ধ্যাড়ায়।

'না বাঁশ গাছ নয়, আমি হলফ করে বলতে পারি।' আমি বলি: 'বাঁশ গাছের গা থেকে কি আঠা বেরয় ? সেই আঠা আগুনে দিলে কি ধুনোর মতন গন্ধ বেরয় কেমন। খুব পুরোনো গাছটা।'

'তাহলে সেই পুরাণকালের গন্ধমাদন পাহাড়ের গাছ হবে হয়ত। সেই ত্রেতাযুগে হনুমানের ঘাড় থেকে পিছলে পড়েছে।' গোবরা অনুমান করেছে।

'না মশাই, আমার শোনা কথা নয়,' হর্ষবর্ধন কন: 'নিজের চোখে দেখা। এক গাদা গাছ, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ দল বেঁধে আমার চোখের সামনে পায়চারি করতে করতে কেটে বেরিয়ে গেল।

চোখের বাইরে চলে গেল একেবারে।'

'আমি একদম্ বিশ্বাস করিনে।' গোবরার প্রতিবাদ: 'পায়চারি করা গাছদের ক্ষমতার বাইরে। তাহলে তাদের পাধপ বলেছে কেন শুনি?'

'পাধপ?'

'পাধপ বলে না গাছদের? কথ্য ভাষায় নয়, অকথ্য ভাষায় যদিও। পাধপ মানে যেখানে ওরা ধপ করে পা ফেলল না, সেইখানেই দাঁড়িয়ে গেল, ধপ করে বসে পড়ল সেইখানেই। একেবারে নট নড়নচড়ন।' গোবরা আবার অকথ্য ওরফে সাধুভাষায় বিবৃত করে: 'মানে, অগ্রপশ্চাৎ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ তিরোহিত। সেই হেতুই পাধপ।'

'কথাটা পাধপ নয়, পাদপ হবে বোধ হয়।' কথ্য ভাষায় কই।

'পাদপ তো বলে সেই গাছদের, একটুতেই যারা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। আপাদমস্তক জ্বলে যায়। সেইসব গাছের জন্যেই বনে বনে দাবানল লাগে।' গোবর্ধন উদাহরণে সবিস্তার। 'তারাই হল পাদপ।'

'ওর কথায় কান দিচ্ছেন কেন? ও তখন কোথায়? ও কি জন্মেছে নাকি? জন্মালেও, আমি যখন বর্মার বনেজঙ্গলে গাছের গুঁড়ি দেখে বেড়াচ্ছি, ও তখন বাড়ির আঙিনায় হামাগুড়ি দিচ্ছে হয়ত!'

'আপনি গাছের গুঁড়ি দেখতে সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে বর্মায় গিয়েছেন? কেন গো! আপনাদের শিলিগুড়িতে কি গুঁড়ি ছিল না?' আমার বিস্ময় জাগে।

'আমাদের সাতপুরুষের কাঠের কারবার জানেন না? কোথায় সস্তায় ভালো কাঠ পাওয়া যায় তার খোঁজ খবর নিতে হয়

আমাদের। আর বর্মার মতন ভালো কাঠ আর কোথায়? টীক কাঠের আসবাবপত্তর দেখেছেন নিশ্চয়? সেসব কাঠ কোথাকার? ওই বর্মার।'

'জানি। খুব টিকসই কাঠ।' তাঁর সটীক ব্যাখ্যার আমার সঠিক ব্যাখ্যান—'তবে কানেই শোনা, এই পর্যন্ত। চোখে দেখিনি কখনো।'

'দেখিয়ে দেব আপনাকে—আসল টীকের তৈরি আলমারি দেরাজ টেবিল চেয়ার ড্রেসিং টেবল ডাইনিং টেবল একসেট উপহার দেব আপনাকে। বেশ তো, দেখবেন। তার কী হয়েছে।'

'রক্ষে করুন, আর দেখাতে হবে না, এইটুকুন ঘর আমার। অতসব রাখবার ঠাঁই কোথায়? তাহলে সেখানে টীকই থাকবে, আমি টিকতে পারব না।'

'না মশাই, শুনবেন না দাদার কথা।...' গোবরা বলে ওঠে—যেমন ওর মাঝে পড়ে কথা বলার স্বভাব: 'দাদার পাল্লায় পড়ে টীকের আসবাব সইতে যাবেন না। টীকের জন্য শহীদ হয়ে যাবেন।'

'পাগল হয়েছ! আমার একফালি ঘর, তার আধখানাই শোবার তক্তপোষে জোড়া। সেটা কী কাঠের জানি না। টীক হবে না বোধহয়। তবে সে বাসায় আমিও যদ্দিন আছি ভাই সেটাও তদ্দিন আমার সঙ্গী। প্রায় আমার মতই টীকসই দেখা যাচ্ছে।...কিন্তু মশাই, একটা কথা না শুধিয়ে পারছি না।' আমার কৌতূহল সম্বরণ করা যায় না—'গাছ দেখতে গেছেন বর্মায়, গুঁড়ি দেখে বেড়াচ্ছেন কেন?'

'গুঁড়ি দেখতে হবে না? কী কাঠ, কী ধরনের, কেমন মজবুত হবে, গুঁড়িতেই তো তার পরিচয়। গোড়াগুড়িই দেখতে হবে তাকে।' তিনি কন—'গাছের গোড়ার থেকেই আমরা আগাই।

ডালপালা দেখি সব। আগাপাশতলা দেখি তার আগাগোড়া, তবে না ঠাহর পাই।'

'তা বটে।' না বুঝেও তাঁর কথায় সায় দেওয়া। আমার মনে হয় উঠন্তি মূলো যেমন পত্তনেই চেনা যায়, গোড়াতেই তার পরিচয় থাকে, (মর্নিং শোজ দা ডে—বলে না?) তেমনি গাছের বেলাতেও সেটা অমূলক হবার কথা নয়।

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন—বর্মায় তার মহড়া চলছে।' হর্ষবর্ধন বলতে থাকেন: 'জাপানীরা সিঙাপুর দখল করেছে, তারপর দলবল নিয়ে জোর কদমে এগিয়ে আসছে বর্মার দিকে—'

'ইংরেজের শিঙে ফুঁকতেই।' গোবরার কথা ফোঁকা।

'তাদের রোখার তোড়জোড় তখন বর্মায়। গোরা পলটনে ছেয়ে গেছে গোটা বর্মা। তারা মার্কিনী কি ইংরেজ আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে কটা চামড়ার। বেশ লম্বাচৌড়া সবাই। সেই সময়ে বর্মা সীমান্তের অরণ্য অঞ্চলে আমি কাঠের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে এক বিশাল প্রান্তরে বিপুল এক জলাশয় আমার নজরে পড়ল। জনমানবহীন জায়গায় কাকচক্ষু সেই শীতল জল—দেখলেই সাঁতার কাটবার লোভ হয়। চারধারে গাছপালা ঘেরা নির্জন জলাশয়, কিনারায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করব ভাবছিলাম, এমন সময় একটা মেয়ে সোলজারকে আসতে দেখলাম সেইখানে। এক মেম সৈনিক। দেখেই না আমি লুকিয়ে পড়েছি গাছগুলোর আড়ালে…'

'ভয়ে?'

'ভয়েও বটে বিস্ময়েও বটে। একটু কৌতূহলও ছিল বইকি! দখাই যাক না মেয়েটা কী করে…'

'কী করল ?'

'বিরাট পুকুরটাকে দেখল তাক করে। তারপরে চারধারে তাকালো একবার। কেউ কোথাও নেই দেখে তার মিলিটারি পোশাক আশাক খুলতে শুরু করল। বুঝলাম তারও ঐ চান করার মতলব···যাতে সে কোনো বাধা না পায় তাই আমি গাছের আড়ালে আরো ভালো করে গা ঢাকা দিলাম।'

'আর সে বুঝি তারপরে···?'

তারপরের কথাটা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না। ভাসা ভাসা জানিয়ে দিই। কবিগুরুর অচ্ছোদসরসীনীর আর শিল্পী হেমেন মজুমদারের রঙীন প্রচ্ছদের কথা মনে পড়তে থাকে।

'হ্যাঁ, তাই।' আভাসেই তিনি বুঝে নেন।—'তার ইউনিফর্ম-টর্ম সব খুলে আমি যে গাছের আবডালে লুকিয়েছিলাম তারই সামনে এসে ফেলে রেখে একেবারে উদোম হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। এই দৃশ্য দেখে না, আকাঠ আমার কথা কী বলব, সাকাঠ গাছ-গুলোও যেন একটু নড়ে চড়ে উঠলো, মনে হল আমার।'

'আশ্চর্য কী ?' গোবরা কয় : 'ভিরমি খায়নি যে সেই ঢের। মূর্ছা হলেই তাদের পতন। মূর্ছা ও পতন বলে না ? অধঃপতনেই বোঝা যেত তখন। ন্যাংটো মেয়ে দেখে দাঁড়িয়ে থাকা সোজা নাকি ? সাক্ষাৎ শিব কেন চিৎপাত হয়ে পড়েছেন তাহলে ?'

'আশ্চর্য কিসের। আচার্য জগদীশচন্দ্র বলে গেছেন গাছরাও সজীব—লতাগুল্ম ইত্যাদি সবসমেত—ঠিক আমাদের মতই। আর প্রাণ যদি থাকে তবে তার চাপ থাকবে, চাপল্যও থাকবে।' আমাকে বলতে হয়।

'মেয়েটা তার ইউনিফর্ম খুলে আমার গাছটার গোড়ায় রেখেছিল।

আমি তাকিয়ে দেখলাম ইউনিফর্মটার গায়ে একটা ফলক লাগানো, সোনার কিনা জানি না, তাতে ক'টা অক্ষর ঝকঝক করছে—W A C I— তার মানে কী মশাই ?'

'তার মানে আমি বলে দিচ্ছি তোমায়।' গোবর্ধনের অযাচিত টীকাদারি : 'বি-এল-এ ব্লে, বি-এল-আই ব্লাই···অতএব, ডবলিউ-এ-সি-আই হল ওয়াসি। ওয়াসি মানে ওয়াশিল। কোনো হিসেবের কিছু ওয়াশিল টোয়াশিল হবে হয়ত।' তার ধারণা।

'ওয়াসি নয় ওয়াকি। সব সৈন্যদলেই থাকে।' আমি জানাই।

'ওয়াকি মানে ?'

'ওয়াকি মানে পদাতিক সৈন্য। সৈন্যবাহিনীর পিছু পিছু যারা ওয়াক করে যায়।' গোবরার পুনরুক্তি : 'তাই না মশাই ?'

'ওয়াকি যে কী বস্তু আমি ঠিক জানিনে। যারা ওয়াকি বহাল করে তারাই ওবিষয়ে ওয়াকিবহাল।'

'আমি ভেবেছিলাম কোনো মেয়ে কম্যাণ্ডার। সেটা তাহলে আমার ভুল ?'

'কিচ্ছু ভুল হয়নি। মেয়ে মাত্রই তো কম্যাণ্ডার—জন্মের থেকেই। কদিন আর তারা ইন্‌ফ্যানট্রিতে থাকে বলুন ? দেখতে না দেখতেই মেজর। তারপরে মেজরটিকে বাঁ-ধারে ফেলে তারা সোজা এগিয়ে যায় লেফটেনাণ্ট হবার জন্যে। তারপর আরেকটু এগুলেই তো একেবারে ঐ কম্যাণ্ডার। তার পরেই কম্যাণ্ডার ইন চীফ সটান। সব মেয়েই। কী যুদ্ধভূমে কি গৃহের ভূমিকায়। কী ধর্মক্ষেত্রে কী কুরুক্ষেত্রে। কম্যাণ্ডার ইন চীফ ওরাই। ওই মেয়েরাই।'

'কম্যাণ্ডার ইন মিস চীফ বলুন!' গোবরা বাতলায় : 'মেয়েদের মিস বলা হয় জানেন না ? তাহলে মিসচীফ হবে তো ?'

'তাও বলা যায়, তবে এটা ঠিক যে তাদের ওপর আর কারো কম্যাণ্ড খাটে না। মিস হলেও তারা কম্যাণ্ডারদেরও কম্যাণ্ডার।'

'তারপর কী হোলো বলি…' হর্ষবর্ধন খেই ধরেন আবার: 'বুকে আরো ঝকমকে তকমা আঁটা আর একজন এলো সেখানে। হয়ত ক্যাপটেন বা মেজর কিছু একটা হবে।

'কোথায় ছিল এতক্ষণ কে জানে। সে এসেই গাছগুলোর আগাপাশতলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব। খানিকক্ষণ। পরিবেশটা খতিয়ে দেখল বেশ করে, কিন্তু পরীর মতন একজন যে উদোম হয়ে জলকেলি করছে সেদিকে সে নজরই দিল না একদম। হঠাৎ সে এক আওয়াজ ছাড়ল—কামফ্লাজ্ কোম্পানি, টেনশন! অমনি গাছ-গুলো সব নড়ে চড়ে খাড়া হোলো যেন—এমনি মনে হোলো আমার।'

'খাড়া তো ছিলই তারা। আরো খাড়া?' দাদারও ওপর গোবর্ধনের কথার খাঁড়া।

'তারপর সেই ক্যাপ্টেন হুকুম করল—কামফ্লাজ কোম্পানি, মার্চ অন্। কুইক্ মার্চ।…অমনি মশাই, বলব কি, আমি তাজ্জব। গাছচালা কি গাছের চালিয়াতি আমি বলতে পারব না, গাছগুলো সব তার হুকুমে একে একে ইতো ভ্রষ্ট ততো নষ্ট হয়ে জোড়ায় জোড়ায় সারি সারি দাঁড়িয়ে পড়ল একধার থেকে। আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে মার্চ করে চলে গেল সবাই—কোথায় কে জানে!'

'আর সেই মেয়েটা?'

'সেই ওয়াকি? একটু যেন হকচকিয়ে গেছল মনে হয়। খানিকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রয়ে জলের থেকে উঠে এগিয়ে এলো সে আমার দিকে…'

'তেমনি উদোম হয়ে দাদা ?'

'কী করবে ? আমার পায়ের গোড়ায় তার ইউনিফর্মটা পড়ে ছিল না ? এগিয়ে এসে পরতে লাগল আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে। একেবারে সামনাসামনি।'

'একটু ব্রীড়াবনত হয়েই বোধ হয় ?' আমার সময়োচিত প্রশ্ন।

'ব্রীড়াবনত কি না বলতে পারি না। তবে কী যেন বিড় বিড় করে বকছিল সে···আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমি তো লজ্জায় মারা যাই, আপাদমস্তক নিজের ইউনিফর্ম পরে শেষ বোতামটি লাগিয়ে নিয়ে ওই বিড় বিড় করতে করতেই চলে গেল সে। আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না।'

'অকুস্থলে তোমাকে দেখে বোধহয় সে বিড়ম্বিত বোধ করছিল। তাই না দাদা ?' টীকাদার গোবরার শেষ টিপ্পনি।